বাঙ্গলার প্রাণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত



প্রকাশক
শ্রীসুরেশ চন্দ্র বর্ম্মণ
আর্য্য পাবলিশিং কোং
২৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩৮

এক টাকা চারি আনা

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ
ঘোষ মেসিন যন্ত্রে
মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

বাঙ্গলার প্রাণ

বাঙ্গলা হইতেছে নদীমাতৃক দেশ। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলার ভূখণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—গড়িয়া উঠিয়াছে—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের শাখানদীসমূহের পলিমাটি দিয়া। কবি বঙ্গমাতাকে বলিয়া গিয়াছেন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা।—কথা কয়টি কল্পনার অতিরঞ্জন, অন্ধভক্তির উচ্ছ্বাস নয়; উহা যে কতখানি সত্য তাহা বাঙ্গালার বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দেশের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে নয় স্পর্শে স্পর্শে অনুভব করিবেন। এমন কোমল সবুজ স্নিগ্ধ রসভরা মাটি আর কোথাও এতখানি চোখে পড়ে না। বাঙ্গলার মাটিতে আঁচড়টুকু দিলেই যেন টস্‌টস্‌ করিয়া রস ঝরিতে থাকে, বাঙ্গলার কৃষক তার ক্ষুদ্র লাঙ্গল-ফলকের স্পর্শমাত্রে সোণা ফলাইয়া দিতে পারে। এ হেন মাটি হইতেছে বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠা।

তারপর এই মাটিতে জন্মিয়াছে, আসিয়াছে, বাড়ি-

য়াছে কোন্ জাতি ? বাঙ্গালী হইতেছে মিশ্র শঙ্করজাতি। বাঙ্গালীর মধ্যে আর্য্য, আর্য্যেতর ও অনার্য্য জাতির রক্ত মিশামিশি হইয়া আছে। কোন্ রক্তের পরিমাণ বা প্রভাব কতখানি, সে অনুপাত নির্দ্ধারণ করিবার ভার প্রত্নতাত্ত্বিকদের উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব ; কিন্তু জাতিটা যে মোটেই বিশুদ্ধ নয়, কিন্তু অনেক বিভিন্ন রকমের ধাতুর সংমিশ্রণে সে যে বিশেষ রকম সঙ্করজাতি, তাহার নিদর্শন ও ফলের দিকে শুধু আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথমত, বাঙ্গালীর চেহারার কথা। বাঙ্গালীর চেহারা অর্থাৎ বাহিরের কাঠামটি সুচারু সুষীম সুষম নয়, সেখানে আছে কেমন একটি নিয়মের বাঁধনের অভাব (irregular features)। যে জাতি আপনাকে যতখানি বিশুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে, সে জাতির চেহারায় সেই পরিমাণে দেখিতে পাই রেখার স্ফুটতা, গাঁথনীর দৃঢ়তা, অঙ্গের অংশে অংশে একটা সমানুপাত। বাঙ্গালীর চেহারায় কিন্তু আছে একটা অসমভাব, পরিবর্ত্তনশীলতার ছায়া, অনিয়মিত গতির ভঙ্গী। তারপর বিভিন্ন জাতি, সঙ্ঘের আছে যে এক-একটা সাধারণ ধরণ বা মূর্ত্তি—আর্য্য হউক, মঙ্গোলীয় হউক, সেমেটিক হউক অথবা নিগ্রোশ্রেণীভুক্ত

হউক—প্রত্যেক জাতির পাই ঐ শ্রেণী অনুযায়ী একটা স্পষ্ট সাধারণ চেহারা ; কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকে ইহার কোন একটি শ্রেণীতে নিঃসন্দেহে ফেলিতে পারি না, বাঙ্গালী যেন একটা খিচুড়ী। শুধু তাই নয়,—বাঙ্গলার নানা অংশে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে চেহারার যতটা বৈষম্য পার্থক্য দেখা যায়, অন্য কোন সঙ্কর-জাতির মধ্যে ততটা দেখা যায় কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর চেহারার বিশেষত্ব, কাঠামে বিষমতা (irregularity) আর ভঙ্গীতে লোলতা লীলাশীলতা (mobility)।

বাঙ্গালীর চেহারার কাঠামে যেমন, স্নায়ুমণ্ডলীর খেলায় প্রাণশক্তির ধারায় তেমনই দেখিতে পাই সেই একই বিষমতা ও লোলচাঞ্চল্য। এখানেও পাই ধৈর্য্যের সংযমের সমতার অভাব (unstable nervous system) ; অল্পতেই সে উত্তেজিত হইয়া উঠে, অল্পেতেই আবার এলাইয়া পড়ে। স্পর্শের সহিত সাড়ার, ক্রিয়ার সহিত প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য ও সমানুপাত নাই। স্নায়ুর ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিতেছে একটা যেন খামখেয়ালী বিসদৃশ ভাব। বিদেশীরা বাঙ্গালীর সম্পর্কে হঠাৎ আসিয়া যদি বলিয়া ফেলে যে, বাঙ্গালীর আছে হিষ্টেরিয়ার ধাত, বাঙ্গালী জাতটা neurotic—তবে তাহা যে একেবারে ভুল হইবে

এমন বলিতে পারি না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী যেমন মাতিয়া গিয়াছিল আবার দমিয়া গিয়াছিল, ভারতের অন্যান্য জাতি তেমন করিয়া মাতেও নাই দমেও নাই। কেরাসিনে পুড়িয়া মরা কিছুদিন আগে আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রায় একটা সংক্রামক রোগ হইয়া উঠিতে চলিয়াছিল। আর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বাঙ্গালীর প্রাণে যে এত গিয়া লাগিয়াছে তার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও কি একটা কারণ নয় যে, বাঙ্গালী সেখানে আপনার প্রাণের একটা নিগূঢ় প্রতিধ্বনি পাইয়াছে, সেখানে সব চরিত্রগুলির মধ্যে পাই না কি প্রাণে একটা অসমতা, কথায় যাহাকে বলে 'ছিট্' ? বাঙ্গালীর স্নায়ুমণ্ডলী দৃঢ় নয়, কিন্তু তাহা অতি তীক্ষ্ণ ; প্রাণশক্তি তাহার নিরেট নয়, কিন্তু নমনীয় ; কর্ম্মে অধ্যবসায় নাই, কিন্তু আছে ক্ষিপ্রতা। বাঙ্গালীর আছে একটা সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি, একটা সজাগ বোধশক্তি (sensitiveness ও sensibility)।

বাঙ্গালী আবার ভাবপ্রবণ, আবেগপরায়ণ ; কিন্তু সেই জন্যই আছে তাহার ভাবুকতা, কল্পনাশীলতা। বাঙ্গালী চপল চঞ্চল, কিন্তু তাই সে নিত্য নূতনের দিকে উন্মুখ। ধীর সাদা চোখে সে বাস্তবকে দেখিতে চায়

না, হৃদয়ের অঞ্জন লাগাইয়া জগৎকে রঙ্গিল করিয়া দেখিতেই তাহার তৃপ্তি। বাঙ্গালী চলিয়াছে চিত্তবৃত্তির দোলায় হেলিয়া দুলিয়া; চিত্তের আবেগকে একমুখীন করিয়া এমন তীব্র করিয়া তুলিতে আর কেহ পারে না। চণ্ডীদাস একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী কবি। এই হিসাবে বিদ্যাপতিও বোধ হয় বাঙ্গালী নহেন, তাঁহার মধ্যে আছে তর্কবুদ্ধির একটা খেলা, একটা এদিক ওদিক চাওয়া, একটা সজাগ ভাব;—চণ্ডীদাস কিন্তু একেবারে আত্মহারা, আপনভোলা কবি।

বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি আছে, কিন্তু তাহাতে পাই প্রতিভার যে থাকিয়া থাকিয়া তড়িৎবিলাস, তীব্র দৃষ্টি বা অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকপাত; সেখানে অভাব তর্কবুদ্ধির ধীর প্রশান্ত আত্মস্থ গতি। চিত্তকে হৃদয়বৃত্তিকে দূরে রাখিয়া শুধু মস্তিষ্ক খাটাইয়া আনন্দ পাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে কিছু কঠিন। চিন্তাকে চিন্তা হিসাবে চিন্তা করিয়া যাওয়াতে প্রয়োজন যে সহিষ্ণুতা যে কৃচ্ছ্রতা, বাঙ্গালীর স্নায়ু সে টানা সহ্য করিতে যেন পারে না। তবে যে চিন্তা তাহার চিত্তকে একবার ধাক্কা দিতে পারিয়াছে, যে চিন্তার উৎস তাহার প্রাণের আবেগ, সেই চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিশেষ পারদর্শিতা

দেখাইয়াছে—এমন কি সেখানে ধীর সহিষ্ণুভাবে যেন জোঁকেরই মত লাগিয়া থাকিয়াছে, তত্ত্বের পর তত্ত্ব তর্কের পর তর্ক নিষ্কাষণ করিয়াছে। বাঙ্গলার মাটিতে শঙ্করের উদ্ভব কিছু কঠিন—সেখানে নিমাই পণ্ডিত জন্মিতে পরে, কারণ, নিমাইএর পাণ্ডিত্যের পিছনে ছিল একটা বিরাট বিপুল প্রাণের ভাবের ভাবুকতার সাগর। বাঙ্গলার নৈয়ায়িক তর্ক করিতে জানে বিশেষরূপে তখন, যখন তুমি তাহাকে চেতাইয়া মাতাইয়া তুলিতে পার; কিন্তু ধীর বিচারে দাক্ষিণাত্যবাসীর সমকক্ষ বোধ হয় বাঙ্গালী নয়। ইহার প্রমাণ আরও এই যে, তর্কক্ষেত্রে বাঙ্গালী যেমন বস্তুতন্ত্রহীন হইয়া পড়ে আর কেহ তেমনটি হয় না। প্রাচীন ফরাসীদের সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে একবার পাগলামী (furia franca) যদি তাহাদিগকে পাইয়া বসে তবে আর রক্ষা নাই, দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান তাহাদের লোপ পায়, যা-তা করিয়া বসে; সেইরকম বাঙ্গালীরও আছে একটা পাগলামীর ধাত।

বাঙ্গলার মাটির মতই বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর মনপ্রাণ—নরম ও নমনীয়; নূতন ভাব নূতন রূপ সহজেই তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে। অন্যান্য কোন কোন শুষ্ক বালু-কঙ্করপূর্ণ কঠিন পাহাড়িয়া দেশের

অনুরূপে তাহার মস্তিষ্ক নিরেট শক্ত হইয়া উঠে নাই, সে সবরকম ছাঁচই ধরিতে যেন প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু আবার বাঙ্গলার আঠালে মাটির মত বাঙ্গালীর মনপ্রাণ যাহাকে একবার ধরে তাহাতে লাগিয়াই থাকে। যাহা শুধু মস্তিষ্কের, শুধু ঔৎসুক্যের জিনিষ তাহাকে প্রাণের চিত্তের জিনিষ করিয়া ধরিতে বেশী দেরি তার লাগে না, আর ধরিলে ছাড়িতেও সহজে সে চায় না। অবশ্য সব সময়ে সমান জোরে জিনিষকে সে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না, প্রাণের তন্ত্রী অল্প আয়াসেই অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু সময় ও সুযোগ পাইলেই অবসাদ কাটাইয়া সে জাগিয়া উঠিতে, শিথিল মুষ্টিকে আবার দৃঢ়বদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করে না।

বাঙ্গালীর স্নায়ুতে, প্রাণে, মনে, মস্তিষ্কে আছে একটা—ভাল কথায়, নমনীয়তা (flexibility)—মন্দ কথায়, অসঙ্গতি (instability)। এই জন্যই বাঙ্গালীর মধ্যে পাই নূতন স্মৃষ্টির সম্ভাবনা। বাঙ্গালী একটা বিক্ষেপ কাটা-ছাঁটা ধরণের গড়নের মধ্যে আপন অন্তরাত্মাকে বাঁধিয়া এখনও দিতে পারে নাই, গতানুগতিক সংস্কার (tradition) তাহার মধ্যে নিবিড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এ জাতিটিতে বিশুদ্ধ রক্তের এত অভাব, এ

দেশের ভূপৃষ্ঠ নদনদীর খাত পরিবর্ত্তনে এত বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, তাই ইহার উপর প্রাচীনের অচলায়তন কীর্ত্তিসৌধ বিপুল ভারে চাপিয়া বসিতে পারে নাই। তাই বাঙ্গালীর অন্তরে একটা অবকাশ একটা ফাঁক আছে, যেখান দিয়া নূতন সৃষ্টির প্রেরণা নিত্যই আসিতে পারে। ফলে হইয়াছেও তাই। আধুনিক যুগে বাঙ্গলা যত নূতন সম্পদ আনিয়া দিতেছে, ভারতের অন্যান্য দেশ তাহা পারে নাই। বাঙ্গলার ধাতুতে আছে একটা স্বচ্ছতা, সেইজন্য উপরের কল্পলোকের অধ্যাত্ম জগতের প্রভাব তাহার মধ্যে যত ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কোথাও তেমনটি হইতেছে না। স্বীকার করিতে পারি, ধারণ-সামর্থ্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ফল সুষ্ঠু সুঠাম সুপরিণত হইয়া উঠে নাই, কিন্তু উপরের আলোকের শক্তির প্রভাব আদৌ যে পড়িতে পারিয়াছে তাহার কল্যাণে সম্ভব হইয়াছে নূতন সৃষ্টি।

বাঙ্গালীর সম্পদ এই উপরের অন্তরাত্মার সম্পদ। কর্ম্মে বাঙ্গালী কুশলী নহে, মস্তিষ্কের ধীর স্পষ্ট দৃঢ় চিন্তাশীলতাও বাঙ্গালীর বিশেষত্ব নয়। বাঙ্গালীর কর্ম্মে আছে আবেগ, চিন্তায় আছে ভাবুকতা। অর্থাৎ কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম, চিন্তার জন্য চিন্তা বাঙ্গালী করে না—

সে কর্ম্ম করে চিন্তা করে যেন আপন অজ্ঞাতসারে ; একটা নিবিড় উপলব্ধি, কোথা হইতে একটা অজানা প্রেরণা তখন তাহার সত্তাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বাঙ্গালী হইতেছে শিল্পীর জাতি—অন্তরাত্মার একটা গভীর রসবোধ তাহার সকল বৃত্তিকে সৃষ্টিকে জীবনকে নিয়মিত করিতেছে, রঙাইয়া তুলিয়াছে। বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যকে ধরিয়া চলিবার, উহাকে সফল করিয়া তুলিবার যত্ন বাঙ্গালীর নাই, বাঙ্গালীর কাজ অনেকটা যেন অহৈতুক অর্থাৎ আনন্দের, সৌন্দর্য্যবোধের। দেশ স্বাধীন হইলে আমরা সকলে ভাল খাইব পরিব, এটা বাঙ্গালীর কথা নয় ; দেশের স্বাধীনতা চাই, কারণ, সুন্দর দেশ আরও সুন্দর হইবে—সুস্মিতাং ভূষিতাং—ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। সুবিধার প্রয়োজনের কথা বাঙ্গালী ভাল বুঝে না, বাঙ্গালী বুঝে ভাবের সুন্দরের কথা। বাঙ্গলার পলিটিসিয়ান অপেক্ষা বাঙ্গলার কবি অনেক বড়।

বাঙ্গালী সুন্দরের পূজারী—কিন্তু তাহা ভাবের সৌন্দর্য্য যতখানি, দেহের সৌন্দর্য্য ততখানি নয়। অলঙ্কার প্রসাধনা ভূরি-ঐশ্বর্য্য এ সকল অপেক্ষা যাহা সহজ সরল অথচ সুশ্রী শোভন তাহার দিকে বাঙ্গালীর

ঝোঁক বেশী। দাক্ষিণাত্যের বিরাট স্থাপত্যকীর্ত্তি সব দেখিয়াছি—কি বিপুল কারুকার্য্যে ভরপূর পাষাণের স্তূপ! তাহাদের দেবতার বিগ্রহ সব অলঙ্কার আর পরিভূষণের মধ্যে যেন ডুবিয়া আছে। বাঙ্গালী সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চায় 'ভারে' নয়, বরং বলিতে পারি 'ধারে'—রেখার সরল সলীল ভঙ্গিমায়। দাক্ষিণাত্যবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদে রঙের দিকে বাহারের দিকে টান, বাঙ্গালী চায় শুধু পারিপাট্য; সাদা রঙ্ বাঙ্গালী যত ভাল বাসে আর কেউ বোধ হয় তেমন বাসে না। বাঙ্গালীর আদি কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে এই দিকটাই প্রতিফলিত হইয়াছে দেখি।

সুন্দরের আর-এক কষ্টিপাথর হইতেছে নারী। সুরূপা রমণী বাঙ্গলা অপেক্ষা বাঙ্গলার বাহিরেই বেশী, কিন্তু বাঙ্গলায় আছে সুশ্রী রমণী। কোন উদ্ভটকার ভারতের নানা প্রদেশের সুন্দরীদের বিশেষত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং; জয়দেবও বোধ হয় 'দন্তরুচিকৌমুদি' দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে কথা জানি না, কিন্তু বাঙ্গলার রমণীর মুখে আছে একটা শ্রী, একটা মনোহারিত্ব। চেহারা গঠনের অনবদ্য সৌষ্ঠব সেখানে না পাইতে পারি, কিন্তু

তাহাকে দেখিয়া মনে পড়ে সলোমনের (Solomon) কথা—I am black but comely। বাঙ্গালীর স্বভাবের প্রাণের কমনীয়তা নমনীয়তা সলীল সলোল ভঙ্গিটিই তাহার চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর গঠনে গ্রীকের সুষীম রেখাপাত (statuesqueness) নাই, কিন্তু সেখানে আছে মাধুরী, লাবণ্য। আর এই লাবণ্য জিনিষটি কি ? বের্গসন ইহার বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

The soul imparts a portion of its winged lightness to the body it animates: the immateriality which thus passes into matter is what is called gracefulness.

শরীরের উপর অন্তরাত্মার ছায়া, মধ্যে জড়ের অধ্যাত্মের অনুরঞ্জনই হইতেছে লাবণ্য।

কোন জাতির বিশেষত্ব শারীরিক সৌন্দর্য্য, কোন জাতির প্রাণের সামর্থ্য, কাহারও বা মন-বুদ্ধির চমৎকারিত্ব ;—কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষত্ব অন্তরাত্মার ভাববৈদগ্ধ। এই অন্তরাত্মার ভাবেরই অনুলেপনায় লাঞ্ছনায় তাহার চিন্তা-জগতে ফুটিয়া উঠিয়াছে উদার সূক্ষ্মদৃষ্টি, কর্ম্মে খেলিয়া চলিয়াছে সৃষ্টিশক্তি, আর দেহে

দেখা দিয়াছে একটা শ্রী। বাঙ্গালীর সমস্ত আধারটিতে প্রতিফলিত লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে যেন আত্মার জ্যোতির্ম্ময় লোকের আভা।

বাঙ্গালীর ভাণ্ডার এই উত্তর-লোক—এই উত্তর-লোকের সত্যই সে দিয়াছে, দিতেছে ও দিবে। সত্যকে তর্কে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা কর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিতে হয় ত বাঙ্গালী অপটু নয়, অন্ততঃ ভবিষ্যতে না হইতে পারে; কিন্তু তাহার আসল কাজ সত্যকে উপলব্ধি করা, অনুভব করা। তাই বাঙ্গালী নবযুগের অগ্রণী পথ-প্রদর্শক। প্রমাণের মধ্যে সত্যকে যখন আগে বুঝিতে চাই, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সত্যকে যখন বাঁধিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠি, তখন পাই কাঁচা সত্য, অর্দ্ধেক সত্য, একরোখা সত্য। বাঙ্গালী সত্যের সকল খোলস ছাড়াইয়া সোজাসুজি প্রবেশ করিতে পারিয়াছে সত্যের মূল সত্তায়। তাই বাঙ্গালীর মধ্যে পাই একটা গভীর অখণ্ড সহজ সত্যের প্রকাশ।

শুধু বাহিরের দিকে বাহিরকে ঘিরিয়া যাহা, বাঙ্গালী তাহার উপর জোর করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই; তাই বিশেষ কোন রূপের মধ্যে কাঠামের মধ্যে আপনাকে ধরিয়া বাঁধিয়া খণ্ডিত করিয়া দেয় নাই। পঞ্চনদবাসীর

শারীরিক বল আছে, মারাঠীর আছে কর্ম্মকৌশল, দাক্ষিণাত্যে পাই ধীর তর্কবুদ্ধি। বাঙ্গালীর আছে কি? আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিব, বাঙ্গালীর আছে 'ইনটুইশন' (Intuition), আর প্রাচীনতর ভাষায় বলিব বাঙ্গালীর আছে 'মর্ম্ম'—বাঙ্গলার প্রথম কবির প্রথম কথা—'মরমে পশিল গো'। বিদ্যাপতিও বাঙ্গলারই হাওয়া পাইয়া যেন বলিয়া গিয়াছেন—'কি পুছসি অনুভব মোয়'। এই মর্ম্মের অনুভব বাঙ্গালীর আর সকল বৃত্তিকে সচল উজ্জ্বল উদার করিয়া ধরিয়াছে।

তাই রসের ভূমি বাঙ্গলাদেশ রসকে যেমন বুঝিয়াছে আর কেহ তেমনটি করিয়া বুঝে নাই। বাঙ্গালীর সৃষ্টি সব আনন্দের সৃষ্টি। বাঙ্গালী 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' কি না জানি না, কিন্তু বাঙ্গালী যে আনন্দের পুত্র তাহাতে কিছু সন্দেহ করিবার নাই। নীরস কর্ত্তব্যজ্ঞান, কঠোর নিগ্রহপ্রয়াস বাঙ্গালীর কর্ম্মের উৎস নহে। বাঙ্গালীর ধাতুতে কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার তেমন স্থান নাই। বাঙ্গালী মহাত্মা গান্ধীর ষ্টোইক (Stoic) আদর্শ প্রাণ ধরিয়া লইতে পারে না—বাঙ্গালীর মানুষ হইতেছে রবীন্দ্রনাথ। দাক্ষিণাত্য শঙ্করকে জন্ম দিয়াছে, উত্তরাপথে নানকের সুরদাসের উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলার মাটিতে

জন্মিয়াছেন চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ। ভক্তির ধর্ম্ম ভারতের অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু ভক্তিরও যে কান্তভাব তাহা বাঙ্গলাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও দেখি সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিকেয়) দেবের পূজা, কোথাও শ্রীরাম বা রামসীতার পূজা—রাধাকৃষ্ণকেও কোথাও দেখি; কিন্তু রাধাভাবের পূর্ণরস এক বাঙ্গালীই বুঝিয়াছে। মহাদেব অনেক জায়গায় আপন আসন পাতিয়াছেন, বাঙ্গালী কিন্তু গৌরীকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। বেদান্তের আদর্শ সর্ব্বত্র সকল আদর্শকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী খুঁজিয়াছে এমন একটি সাধনা যাহা—'বেদবিধি পার'। আত্মার পূজা শুধু নয়, কিন্তু মানুষের পূজা—সহজ-সাধনা বাঙ্গালার প্রতিভার দান।

বাঙ্গালী হইতেছে প্রকৃতির সাধক। বাঙ্গালীর ধর্ম্মে সাহিত্যে দেখি জমিয়াছে এই প্রকৃতিপূজার উৎসব। বাঙ্গালীর ইষ্ট পুরুষ নহে। নিরালম্ব, সমাধিগত, আত্ম-রত স্থৈর্য্যকেই সে একান্ত করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙ্গালী চাহিয়াছে প্রকাশ, লীলা। বাঙ্গলা তাই মায়ের —শক্তির পীঠ। বাঙ্গলা আনন্দের ক্ষেত্র—অক্ষরব্রহ্ম বাঙ্গলার লক্ষ্য নয়—বাঙ্গালীর প্রাণে অধিষ্ঠিত হ্লাদিনী

শক্তি। আধুনিক বাঙ্গলার গোড়ায় দেখি শক্তিসাধক রামমোহন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তিসাধক। বেদান্ত তাঁহাদের উপর যতই প্রভাব ছড়াইয়া থাকুক না কেন, শক্তির সাধনা ছিল তাঁহাদের মর্ম্মের বস্তু। আর অন্যক্ষেত্রে আজকাল জগদীশচন্দ্র প্রকৃতিসাধনায় যে একটা নূতন দিক্ দেখাইতেছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গলার প্রতিভারই ছায়া কি দেখিতেছি না?

বাঙ্গালীর একটা অখ্যাতি আছে যে, সে 'ঘরমুখো'। ঘরকন্নার আনন্দ তাহার মধ্যে অতি প্রবল। গৃহস্থালির চিত্র সে তাহার কাব্যে গানে ছড়ায় এমন ফলাইয়া রসাইয়া আঁকিয়াছে আর কোথাও তেমনটি দেখি না।

বৈষ্ণব কবির—

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।

অথবা—রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।—

শুনিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ কি একটা নিবিড় টানে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। কবিকঙ্কণেত বাঙ্গালীর-গার্হস্থ্য জীবনের একটা পূর্ণ আলেখ্যই পাই। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম

সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের উদার উদাত্ত কাহিনী ছাড়িয়া যখন ঘরের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখনই যেন পাইয়াছেন নিজের কোট। বঙ্কিমচন্দ্রে ও আধুনিক শরৎচন্দ্রে বাঙ্গালীর পারিবারিক চিত্রই বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে যাহা হউক, কিন্তু এই 'ঘরমুখো' ভাবের অর্থ কি ? ইহার অর্থ জীবনের নিবিড় রসের উপর বাঙ্গালীর টান—ইহাও বাঙ্গালীর প্রকৃতিপূজার একটা দিক্। অবস্থায় পড়িয়া এই ভাবটি সঙ্কীর্ণতার, দুর্ব্বলতার আশ্রয় হইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু অন্য অবস্থায় পড়িলে ইহা হইত জীবনের মধ্যে থাকিয়া, মানুষের সাথে মিলিয়া মিশিয়া, আদানে প্রদানে যে আনন্দ—যাহাকে পারিবারিক টান বা domestic instincts বলি তাহাই হইত social virtues, সামাজিক গুণ বা ধর্ম্ম। আর মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যেই যে ভাগবত স্বর্গীয় জীবন স্থাপনের একটা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি, তাহাতে 'ঘরমুখো' বাঙ্গালীর মনপ্রাণ যতখানি মাতিয়া উঠিতে পারিবে আর কেহ তত সহজে পারিবে কি না জানি না।

আনন্দের সন্তান, রসের পূজারী, প্রকৃতির সাধক

বাঙ্গালীর মধ্যে তাই দেখা দিয়াছে একটা পূর্ণ-জীবনের আদর্শ, একটা বৃহৎ সামঞ্জস্যের প্রয়াস। বাঙ্গলার নদ নদী সব নানা জায়গা হইতে মাটি আনিয়া—ঢালিয়া মিশাইয়া—বাঙ্গলার দেশকে তৈয়ার করিয়াছে। নানা-দিক হইতে নানাজাতি—দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, অনার্য্য, আর্য্য —সকলে আসিয়া মিশিয়া বাঙ্গালী জাতিকে জন্ম দিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে তাই দেখি বহুলবিচিত্র প্রেরণা, তাহার মনে নানামুখীন কৌতূহল, তাহার অন্তরাত্মায় সকলের একটা মিলন-সামঞ্জস্য। বাঙ্গলায় আছে, প্রেমের ধারা, আবার আছে শক্তির ধারা। বাঙ্গলায় তন্ত্র আছে, কিন্তু সে তন্ত্রের মধ্যে বেদান্তও আছে। তাই বাঙ্গালীর মুখে শুনি "তারা ব্রহ্মময়ী।" বাঙ্গলার ভাবুকতা আছে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রও আছে—নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী কোলাকুলি করিয়া আছে। আমরা বাঙ্গলার সরল শ্রী, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী যে আবার ঐশ্বর্য্যের ভক্ত নয়, তাহাও বলা যায় না। বাঙ্গালী চাহিয়াছে উজ্জ্বলে মধুরে মিলন, সরলতা ও শোভার সামঞ্জস্য—আড়ম্বর সে না চাহিতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে নাই। বাঙ্গালী জীবন চাহিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অধ্যাত্মকে ভুলিবার আবশ্যকতা

অনুভব করে নাই। বৈরাগ্য হইতে সে দূরে থাকিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মুক্তিকে দূর করিয়া দেয় নাই। বাঙ্গলা তাহার ঘরখানি চাহিয়াছে, কিন্তু বাহিরকেও তাহার সাথে যোগ করিয়া দিতে চাহিয়াছে।

তবে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা হইতেছে রস, জীবন, পৃথিবী —মাটি। তাহার পা হইতে মাথা অবধি সমস্ত আধারের মধ্যে প্রবাহিত তরঙ্গিত হইয়া যাইতেছে প্রকৃতিরই উদার লীলাময় গতি। বাঙ্গালী জাতিকে অনেক সময় নারীজাতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। কথাটী যে অনেকখানি সত্য তাহাতে সংশয় নাই। নারীর স্পর্শালুতা (sensitiveness), অনুভব-প্রাখর্য্য, নারীর কমনীয়তা, নমনীয়তা, নারীর একটা দোলাচলবৃত্তি অথচ সেই সঙ্গেই এক তীব্রনিষ্ঠা, নারীর শ্রী ও হ্রী, সকলের উপরে নারীর একটা সহজাত অপরোক্ষ অনুভূতি—সবই বাঙ্গালীর ধর্ম্মে কর্ম্মে শিল্পে সাহিত্যে স্পষ্টই দেখিতে পাই। নারীর প্রতিষ্ঠা যেমন প্রাণময় জগতে, এই প্রাণের সুরে ও রঙে যেমন তাহার আর সকল জগৎ অনুরণিত অনুরঞ্জিত, সেই রকম বাঙ্গালীও দাঁড়াইয়াছে এই প্রাণময়, এই জীবনী ধারার উপরে। বাঙ্গালী সাদা অধ্যাত্মকে ধরিতে জানে না, তাই বাঙ্গালী মায়াবাদের অর্থ বুঝিতে সাধু সন্ন্যাসী হইতে

চাহে না। বাঙ্গালী আবার সাদা জড় লইয়াও থাকিতে পারে না—তাই ব্যবসা বাণিজ্যে বা শুধু পলিটিক্যাল কাজে সে এত পিছনে, বাঙ্গালীর বদনাম বাঙ্গালী practical নয়। কিন্তু এই দুই অতি-বাদের মাঝখানের জগৎটি বাঙ্গালী অধিকার করিয়াছে। ইহাতে অনেক সময়ে তাহাকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ভাবেই সে যে একটা বৃহত্তর সামঞ্জস্য, নিবিড়তর সত্যকে পাইতে চলিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

প্রবাসী ১৩২৭

বাঙ্গালীর শক্তিপূজা

(১)

বাঙ্গালীর পূজা ঐশ্বর্য্যের, বৈচিত্র্যের, পূর্ণতার পূজা। বাঙ্গালীর ইষ্ট এক-দেবতা নয়, বাঙ্গালীর ইষ্ট বহুদেবতা —সকল দেবতার সম্মিলনীশক্তি। অন্যান্য প্রদেশের সাধনায় দেখি কোন একটী বিশেষ দেবতাকেই চরম করিয়া ধরা হইয়াছে—বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়, গণপতি; এই এক মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে বড় জোর যুগল-মূর্ত্তির স্থান দেওয়া হইয়াছে—হরগৌরী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ। কিন্তু বাঙ্গালীর পূজার প্রতিমায় দেখি যে বহুল বিচিত্র দেবশক্তির সমাবেশ—সে দশভূজার পূজা আর কোন জাতির প্রাণ তেমন করিয়া অধিকার করে নাই। বাঙ্গলাতেও আছে এক এক দেবতার পূজা, কিন্তু দশভূজার পূজাই বাঙ্গালীর 'পূজা'।

তাহার কারণ বাঙ্গালী চায় প্রকাশ, পূর্ণ প্রকাশ—দেবশক্তির বহুবিচিত্র অভিব্যক্তি। পৃথিবীকে জগৎকে কেহ মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে; প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্যময় লীলা মতিভ্রম মাত্র, একমাত্র সৎপুরুষই সত্য

—এই যাহাদের অনুভব তাহাদের মন্ত্র যে হইবে "শিবোঽহং শিবোঽহং" তাহা আশ্চর্য্যের নয়। অথবা যাহারা দেখে জগতের প্রকৃতির মধ্যে একটা কোন বিশেষ ছন্দ, তাহারা যে সেই বিশেষ ছন্দদ্যোতক একটা রূপ—একটা বিশেষ দেবতা বা একীভূত দেবতাযুগলের নৈষ্ঠিক পূজারী হইয়া পড়িবে, তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গালী চায় এমন অখণ্ড সত্য যাহা আর সকল সত্যকে ছাটিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নয়, কিন্তু তাহাদিগকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে বলিয়াই অখণ্ড। "একং সৎ" বাঙ্গালীর সাধনার বিশিষ্টতা দেয় নাই, বাঙ্গালীর সাধনার বিশিষ্টতা দিয়াছে "বহুধা বদন্তি।" এক সত্যকে বহু রকমে বলা হইতেছে, প্রকাশ করা হইতেছে—তাই বলিয়া সেই 'এক'টাই সত্য, আর 'বহু'টা ভুল, তাহা নয়। "অগ্নি যম মাতরিশ্বা" একই দেবের বিভিন্ন রূপ, তবুও উহাদের প্রত্যেকেরই আছে আবার পৃথক্ সত্য, পৃথক্ কর্ম্ম। সকল দেবতার যে বহুল প্রতিভা তাহারই সমবায় 'বিশ্বদেব',—এই বিশ্বদেবেরই পূজারী বাঙ্গালী।

সকল দেবতার দেবত্ব অঙ্গে অঙ্গে আধারের স্তরে স্তরে ভরিয়া লইয়া যে পূর্ণ দেবত্ব তাহাই বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য।

বাঙ্গালীর ইষ্টের তাই জটিল মূর্ত্তি। শান্ত শিব মহাদেব, তিনি সকলের উপরে, মাথায় আছেন স্থির প্রতিষ্ঠারূপে। তাঁহারই লীলা প্রকাশ ঐ নানা-প্রহরণধারিণী দশভূজা। শ্রী সম্পদ সৌভাগ্য দিতেছেন ঐ নারায়ণী শক্তি লক্ষ্মী। সরস্বতী আমাদের—দিব্য জ্ঞানের, কার্ত্তিকেয় আমাদের দিব্য বীর্য্যের উৎস। গণপতি সমবেত সাধনার প্রতীক। এমন কি দেহগত চেতনার শুদ্ধশক্তি মূর্ত্ত ঐ পশুরাজ সিংহে।

শক্তি—শক্তির বহুধা বিচিত্র বিভবই বাঙ্গালীর জীবন-সত্য। নিশ্চল এবং অদ্বৈত সৎ কিম্বা সাক্ষী-মাত্র পুরুষ নয়, কিন্তু সেই সৎ সেই পুরুষ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে যে বহুভঙ্গিম চিন্ময় রূপায়ন, জাগতিক জীবনের যে নানাবিধ রসায়ন তাহাকেই বাঙ্গালী ধরিয়াছে, ফলাইয়া তুলিতে চাহিতেছে। জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া নয়, এমন কি তাহার শুধু একটা খণ্ড দিক স্বীকার করিয়া নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনকে পূর্ণ সত্যের মধ্যে ফুটাইয়া বিকশিত করিয়া লইতে হইবে। সজীব সবুজ সমৃদ্ধ প্রকৃতির লীলাভূমি এই বঙ্গদেশ প্রকৃতি-পূজার পীঠস্থান। প্রকৃতির সত্য-কি ধর্ম্ম কি ছন্দ কি, প্রকৃতির লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য কি

সার্থকতা কোথায়, ইহাই বাঙ্গালীর অন্তরাত্মার সমস্যা। বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধনায়, বাঙ্গালীর সাহিত্যে শিল্পে এই প্রকৃতির টান—প্রাকৃত টান আমরা বলিব না, কারণ সে প্রকৃতির মধ্যে অতি প্রাকৃতের বা পুরুষের ব্যঞ্জনা অপরিস্ফুট নয়—এই পৃথিবীর সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ, দেবতার সহিতও এই মানুষীভাব, এই ইহমুখী প্রেরণা লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালী তাই মায়ের সন্তান। মায়ের স্বভাবই তাহার স্বভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার দেহে কি একটা নমনীয়তা একদিকে সে জন্য দুর্ব্বল হইলেও, অন্যদিকে সেখানে নূতন ছন্দ সহজেই প্রতিফলিত হইতে পারে; তাহার প্রাণ স্পর্শালু, তাহার মস্তিষ্ক সাক্ষাৎ অনুভূতিগত প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। জ্ঞান-বিচারের পথ তাহার নহে, তাহার পথ ভক্তি-বিধৃত ধর্ম্ম, রসালু প্রাণের নিত্য আত্ম-নিবেদন। পুরুষ অপেক্ষা পুরুষের যে হ্লাদিনীশক্তি তাহাকেই সে এমন বড় করিয়া দেখিয়াছে—শিব অপেক্ষা কালী দুর্গা, নারায়ণ অপেক্ষা লক্ষ্মী, কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাই তাহার হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে। অন্তরের সাধনার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বাহিরের দিকে তাকাই তবে দেখি

নাকি সামাজিক জীবনেও তাহার আজ এই নারী-মঙ্গলের গীত দিনে দিনে স্ফুট মুখর হইয়া উঠিতেছে ?

বাঙ্গালীর পূজার পিছনে রহিয়াছে যে ভাব যে প্রেরণা তাহাকে সজ্ঞানে যেন ধরিতে সে চেষ্টা করে। এই সজ্ঞানতার অভাবই তাহার জীবন-সাধনায় আনিয়া দিয়াছে সেই প্রেরণার যা-কিছু বিকৃতি ও অবনতি। বাঙ্গালীর বিশেষত্বকেই জিয়াইয়া রাখিতে হইবে, বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। এই বিশেষত্বকে বাঁচাইতে হইবে তুই দিকের আক্রমণ হইতে। এক বিশ্ব জাগতিক ভাব ও সর্ব্বভারতীয় ভাব—সকল মানুষ সমান, সারা ভারত এক, সুতরাং সব একাকার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। দেশগত (প্রদেশগত) পাত্রগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই সমষ্টির একত্বকে পূর্ণরূপ দিতে পারে। আর এক দিকে বাঙ্গালীর যে অন্ধ সংস্কারগত ধারায় সঙ্কীর্ণ পথ তাহাকেও একান্ত করিয়া ধরিলে চলিবে না—কারণ সে পথে যে সব রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বাহিরের জিনিষ, বাঙ্গালীর অন্তরের প্রেরণা সে সকলের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিফলিত হইলেও সম্যক জ্ঞানের অভাবে, সজাগ সাধনার অভাবে, তাহারা বাঙ্গালীর অন্তরাত্মার মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া উঠিতে পারে না।

বাঙ্গালীর যে মায়ের পূজা, প্রকৃতির পূজা, শক্তির পূজা তাহার যথাযথ অর্থ নিরূপণ করিয়া বাঙ্গালী কায়মনোবাক্যে সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া উঠুক। বাঙ্গালী চাহে যে শ্রী, যে যশ, যে আয়ু, যে সৌন্দর্য্য যে বীর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য—জাগতিক জীবনে যে পরিপূর্ণ সার্থকতা, তাহার জন্য সজ্ঞান তপস্যায় আপনাকে নিয়োগ করুক।

বিজলী ১৩৩০

বাঙ্গালীর শক্তিপূজা

২

বাংলা হইতেছে শক্তিসাধনার পীঠস্থান। শক্তি-সাধনার বিশেষত্ব কি? সাধনার মোটামুটি তুইটি ধারা ভারতবর্ষে প্রচলিত। এক এই শক্তি-সাধনা, আর বেদান্ত-সাধনা। স্থষ্টির মধ্যে আছে তুইটি তত্ত্ব; সেই তুইটি মূল-সূত্রের সংযোগে লীলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

পুরুষ ও প্রকৃতি—এই তুই হইতেছে জগৎ রহস্যের গোড়ার বস্তু। পুরুষ কি, প্রকৃতি কি? পুরুষ হইতেছে সত্তা, আর প্রকৃতি হইতেছে শক্তি। পুরুষ স্থষ্টির অন্তরালে নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অস্তি-জ্ঞান। আর প্রকৃতি সেই প্রেরণা, সেই আনন্দের প্রতিভা যাহার বলে জগৎ জন্মিয়াছে, চলিয়াছে, নিত্য নবোন্মেষে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ হইতেছে স্থিতি, আর প্রকৃতি হইতেছে গতি। পুরুষ "আছে" আর প্রকৃতি "হইতেছে"। পুরুষের অন্য নাম শিব, প্রকৃতির অন্য নাম আদ্যাশক্তি।

মানুষের সাধনা এই তুই পথে চলিতে পারে, পুরুষকে

ধরিয়া অথবা প্রকৃতিকে ধরিয়া। বেদান্তের সাধনা পুরুষকে ধরিয়া, শক্তির সাধনা প্রকৃতিকে ধরিয়া। বেদান্ত সাধনার উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে পুরুষের মধ্যে তুলিয়া ধরা, প্রকৃতির সকল লীলা পুরুষের নিস্তরঙ্গ সত্তায় ডুবাইয়া মিলাইয়া দেওয়া। শক্তি-সাধনার উদ্দেশ্য পুরুষকে প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ করাইয়া, প্রকৃতির নিবিড়তম উচ্চতম লীলা ফুটাইয়া তোলা। বেদান্ত-সাধনার চরম লক্ষ্য সমাধি, লয়—শক্তি-সাধনার আসল লক্ষ্য জাগ্রত জীবনে একটা তুরীয়শ্রী, বিজয় ও বিভূতি প্রতিষ্ঠা করা।

মানুষের, জীবের মধ্যে পুরুষের প্রকাশ হইতেছে অহং, "আমি" বা "আমি আছি" এই জ্ঞান; আর প্রকৃতির প্রকাশ হইতেছে আধার, আধারে খেলিতেছে যে শক্তি। বেদান্ত সাধক তাই দাঁড়ান অহং জ্ঞানের উপর এবং চলেন নেতি নেতি পথে। আমি আছি আর আছে আমার আধার; আমি এই আধার নই, আমি দেহ নই, প্রাণ নই, মন নই, আমি হইতেছি দ্রষ্টা সাক্ষী মাত্র এবং আমার দৃষ্টি এই সকল বস্তু হইতে তুলিয়া লইতে পারিলে ইহারা সব লোপ পাইবে, আমি চলিয়া যাইব আরও উপরে, আমার স্বরূপে, আমার একং অদ্বিতীয়ং শিবরূপে। বিচার ও

বিবেক দিয়া একে একে প্রকৃতির সকল বন্ধন কাটিয়া উঠিয়া সৃষ্টির মূল সত্তার সহিত একীভূত হইয়া যাইব।

শক্তি-সাধকের সাধনার কেন্দ্র অহংজ্ঞান নয়, কিন্তু আধারের শক্তি। বেদান্তসাধকের কাছে অহংএর যে মূল্য, শক্তিসাধকের অহংএর সে মূল্য নাই। বেদান্ত-সাধক অহংকে দেখেন সেই পরমাত্মার পরম সত্তার মধ্যে পৌঁছিবার আশ্রয় রূপে। শক্তি-সাধক অহংকে দেখেন শিব-শক্তির সম্মিলিত লীলার, প্রকাশ-বৈচিত্র্যের প্রণালী-রূপে। শক্তি-সাধকের কাছে অহং হইতেছে এই আধারেরই একটা অঙ্গ, অন্যান্য অঙ্গের সহিত যে রকম ব্যবহার করিতে হইবে, ইহার সহিত সেই রকমই ব্যবহার করিতে হইবে।

বেদান্ত-সাধনার পথ হইতেছে জ্ঞানের পথ অর্থাৎ অহংজ্ঞানের বিচারের বিবেকের পথ। সাধকের কর্তৃত্ববোধ ছাড়া এ সাধনা চলিতে পারে না। শক্তি সাধনা হইতেছে আত্মসমর্পণের পথ—আপন কর্তৃত্ব সর্ব্বথা বিলোপনেই এখানে সিদ্ধি। শক্তি-সাধক প্রকৃত পক্ষে নিজে সাধক নহেন; নিজেকে, অহং বোধকে, আধারকে নিঃশেষ আদ্যা-শক্তির চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাই তাঁহার মধ্যে সাধক হইতেছে প্রকৃতি স্বয়ং।

বেদান্ত-সাধক প্রকৃতিকে জয় করিতে চাহিতেছেন পুরুষের বল দিয়া পুরুষকার দিয়া। শক্তি-সাধক প্রকৃতিকে জয় করিতেছেন প্রকৃতিকে দিয়া। বেদান্তসাধক প্রকৃতির খেলা চাহেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে সমূলে বিলোপ করা—প্রকৃতির উপরে উঠিয়া যাওয়া। শক্তি সাধক আগ্যাশক্তির কাছে সকল পুরুষকার বলি দিয়াছেন, আধারের মধ্যে সেই আগ্যাশক্তির যথেচ্ছ প্রকাশ ও লীলার জন্য।

আগ্যাশক্তি হইতেছে চিন্ময়ী শক্তি। আগ্যাশক্তির একটা মায়াময়ী শক্তি আছে বটে, যাহার ফলে হইতেছে অবিগ্যা, অজ্ঞান, অশক্তি। বৈদান্তিক এই অবিগ্যার শক্তিকে এড়াইতে গিয়া, আদ্যাশক্তিকেও এড়াইয়া শিবত্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শক্তি-সাধক জানেন যে, আদ্যাশক্তির অন্তরেই সেই শিবত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে পৃথকভাবে একান্ত ভাবে ধরিবার কোন প্রয়োজন নাই। সকল সঙ্কল্প সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি চিন্ময়ী শিবশক্তির হাতে আপনাকে যন্ত্রবৎ স্থাপনা করেন। এবং এই সমর্পণ, এই নতি তাঁহার যত পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হয় ততই আধারের অবিদ্যাশক্তি ঘুচিয়া গিয়া সেখানে ফুটিয়া উঠিতে থাকে চিন্ময়ীর বিদ্যাশক্তির একটা ছন্দ,

একটা ধর্ম্ম—এই আধার এই জীবনই রূপান্তরিত হইয়া দেখা দেয় একটা দিব্য গঠনে, দিব্য সার্থকতায়।

বাঙ্গলা এই শক্তি-তত্ত্ব বুঝিয়াছে, বুঝিয়াছে যে শক্তির প্রসাদ ব্যতিরেকে মুক্তি হইতে পারে কিন্তু সিদ্ধি নাই। বাঙ্গালী নির্ব্বাণ চায় নাই, লয় চায় নাই, সে চাহিয়াছে জয়, সে চাহিয়াছে শ্রী, সে চাহিয়াছে ঐশ্বর্য্য। তাই বাঙ্গলার দেশে প্রকৃতির রসময়রূপ—এত শোভা, এত প্রাচুর্য্য, এত ঋদ্ধি। প্রকৃতির পূজারী বাঙ্গালী দেবীকে যত পূজা করে, দেবকে তত করে না। তাই ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধারই প্রভাব এখানে বেশী। তাই শিব আপন রুদ্রশক্তি শিবানীর পদতলে শায়িত।

প্রকৃতিকে ফলাইয়া ফুটাইয়া ধরিতে হইলে, মানব-জীবনকে বিশুদ্ধ করিয়া একটা গভীরতর সত্যে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই প্রকৃতির পূজা, আদ্যাশক্তির হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা। নতুবা প্রকৃতির নিয়ম বাঁধিয়া দিবে কে? প্রকৃতিই নিজের নিয়ম নিজে বাঁধিতে পারে, নিজের সত্য ধর্ম্ম নিজে বিকসিত করিতে পারে—মানুষের পুরুষকারের সে সামর্থ্য নাই, নিষ্ক্রিয় স্থাণু পরম পুরুষেরও আপনা হইতে সে যোগ্যতা নাই।

বিজলী ১৩২৯

বাঙ্গলার ত্রিমূর্ত্তি

রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—এই শক্তিত্রয় নব্যবঙ্গের অভিব্যক্তি ধারায় তিনটি ক্রম, বিষ্ণুর ত্রি-পাদের ন্যায় এই তিন মহাপুরুষ বাঙ্গলার ক্রমবিকশিত চেতনার তিনটি পর্য্যায় অধিকার করিয়া আছেন। রামমোহনে আধুনিক বাংলার প্রথমে জাগিল অন্তরাত্মা, বঙ্কিমচন্দ্রে ফুটিয়াছে তাহার মন আর বিবেকানন্দে ফুটিয়াছে তাহার প্রাণ।

ফলতঃ সকল সাধনা, সকল সৃষ্টির ধারাও এই একই ক্রম অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে দেখি। বাস্তবে যে সত্য শরীরী হইয়া দেখা দিবে, প্রথমে তাহার আবির্ভাব হয় অন্তর-পুরুষের প্রজ্ঞায় বা ভাব-ঘন চেতনায়—হৃদি প্রতীষ্যা। তার পর মন তাহাকে ধরিয়া লইয়া—মনসা অভিক্লৃপ্ত—আরও ব্যক্ত স্ফুট করিয়া ধরে। তার পর আর এক ধাপ নামিয়া আসিয়া তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে, পায় জীবনীশক্তি, অন্তঃকরণ ছাড়িয়া বাহিরে প্রকাশ হইতে সুরু করে। সর্ব্বশেষে দেহে স্থূলে আসিয়া সে হয় মূর্ত্ত নিরেট, হয় বাস্তব।

অন্তরাত্মার ভাবে বা হৃদ্‌পুরুষের প্রজ্ঞায় হইতেছে সত্যের প্রথম উন্মেষ, তাহার বীজ-মূর্ত্তি, তাহার "স্বরূপ"। মনে তাহার নানা সম্ভাবনা লইয়া বহুল বিচিত্র লীলা, জল্পনা কল্পনা। প্রাণে তাহা একটা বিশেষ ছাঁদ লইয়া হইয়া উঠিতেছে জীবন্ত শক্তিমন্ত। পরিণামে দেহে আনিয়া দিতেছে তাহার পার্থিব রূপ।

প্রথমে অন্তর পুরুষের জাগরণ। এই হৃদয়স্থ জীবাত্মা যখন সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সুপ্তির বা সমাধির বা একান্ত আত্মরতির অবস্থা হইতে উঠিয়া বাহিরের দিকে,—প্রথম চক্ষু মেলিয়াছে ব্যক্ত প্রতিষ্ঠান সকলে, পৃথিবীতে, জীবনে চাহিতে সুরু করিয়াছে তাহার ন্যায্য অধিকার, সার্থকতা—তখনই সাধারণ ভাষায় বলা হয়, সেই মানুষের ডাক আসিয়াছে বা "সময় হইয়াছে।" কিন্তু চেতনার অনেকখানি নিভৃতে সূক্ষ্মলোকে এই প্রথম জাগরণ; অন্তরাত্মার উদ্বুদ্ধ শক্তি বা সত্য একটা যেন আবরণ বা অন্তরালের পিছনে থাকিয়া কাজ করে; মানুষ সব সময়ে জাগ্রত চেতনায় তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বা অর্থ ধরিতে কি বুঝিতে পারে না।

রামমোহনে বাঙ্গলার চেতনা পাইয়াছে এই প্রথম অবস্থা। তিনিই আধুনিক বাঙ্গলার অন্তরাত্মা বা কারণ-

পুরুষ—অতীতের যুগ হইতে, প্রাচীনতা হইতে আধুনিক-যুগের মুক্ত আলোকে বাতাসে তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেশের চেতনাকে টানিয়া আনিয়াছেন, নূতন যুগের নূতন ধর্ম্মে প্রথম দীক্ষা দিয়াছেন; তাঁহারই মধ্যে সকল ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির বীজরূপ দেখা দিয়াছে—তাঁহার প্রজ্ঞায় যে এক একটি ভাব-ঘন চৈতন্য-কণা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই ক্রমে লতা পাতা ফুলে ফলে মুঞ্জরিত বিকশিত হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতি জাতির সমষ্টিগত জীবনের প্রধান যত ক্ষেত্র, সর্ব্বত্র তিনি আনিয়া দিয়াছেন একটা নূতন জন্ম, নূতন জীবন, নূতন সৃষ্টি। দেশের ভাবী সার্থকতার মূল ছক তিনিই আঁকিয়া গিয়াছেন—তিনিই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন মূল সূত্র সব—পরবর্ত্তী কালের স্রষ্টারা তাহাকেই পাকা বনিয়াদ রূপে গ্রহণ করিয়া তবে নূতন নূতন গঠনের আয়োজন করিয়াছেন। রামমোহন সত্য সত্যই হৃদয়-পুরুষ। উপনিষদ বলিতেছে, আধারের সহস্র নাড়ী এই হৃদয়-দহরে আসিয়া মিলিয়াছে, এখান হইতে উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া গিয়াছে। সেই রকম রামমোহনেও দেশের নব শিক্ষা, দীক্ষা, আধুনিক চেতনার সকল সাধন-ধারা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং তাঁহার হইতেই

সে সকল দেশের জাগ্রত চেতনার ক্ষেত্রের দিকে বহিয়া চলিতে সুরু করিয়াছে।

অন্তরাত্মার মধ্যে সত্য যখন জন্মিয়াছে, যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন সে নামিয়া আপনাকে প্রকটিত করে মনের ক্ষেত্রে। বুদ্ধি বিচার তাহাকে ধরিয়া দেখে শুনে, তাহার অর্থ কি, দাবি কি প্রভৃতি নানা জিজ্ঞাসায় তাহাকে পরীক্ষা করে, চেতনার অনুভবের সন্নিকটে আনিয়া ধরিতে চেষ্টা করে।

বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রে দেশের এই মন-পুরুষ জাগিয়াছে—দেশের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তাহার নিভৃত অনুভবকে তিনিই চিন্তায় সম্যক্ ব্যক্ত ভাষায় মুখর করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেই প্রথম মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সারা দেশে একটা নূতন কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা, পর্য্যবেক্ষণা। অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা-বৃত্তি, বহুমুখী গবেষণা, বিচার বিতর্ক, তাঁহারই হইতে উঠিয়া একটা প্লাবনের মত সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে। কল্পনার নানা চিত্র নানা উদ্ভাবনা মনের এই বহুমুখী অনুসন্ধিৎসারই পরিচয় দিতেছে। অন্তরাত্মায় যাহা একটি নিবিড় সংহত ভাবমাত্র, মনে তাহা শত খণ্ডে ফাটিয়া ছড়াইয়া গিয়াছে। একটি ভাব-বস্তুর কত ক্ষেত্রে কত রকম প্রয়োগ হইতে পারে,

কতদিকে কতরূপে তাহার প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে —এই সকল লইয়া মন করিতেছে জল্পনা-কল্পনা এবং মনের এই জল্পনা-কল্পনার একটা ব্যক্ত রূপই হইতেছে সাহিত্য।

বঙ্কিম-সাহিত্যে আধুনিক বাংলার মন তৈয়ারী হইতে সুরু হইয়াছে। নূতন নূতন ভাবকে চিন্তাকে বুঝিতে সমাদর করিতে একটা তৎপরতা, নূতন নূতন তথ্যকে আদর্শকে আবিষ্কার করিয়া চলিতে একটা উন্মুখী গতি বাঙ্গালীর মধ্যে যদি সহজ হইয়া থাকে তবে তাহার মূলে বঙ্কিম। একটা সজাগ সরস সমর্থ মন, বুদ্ধি—ততখানি শুষ্ক তর্কবিলাসী নয় যতখানি নিভৃত অন্তর্জ্ঞানে অনুপ্রাণিত, এমন চিন্তা যাহা সার্থকতা চায়, বাস্তবে হৌক আর কল্পনায় হৌক, রূপের বিগ্রহ রচনায়, আধুনিক বাঙ্গলার চেতনায় ইহাই বঙ্কিমের দান।

তারপর মনে যাহা প্রকট সচেতন হইয়াছে. রূপ পাইয়াছে, প্রাণের মধ্যে নামিয়া আসিলেই তাহা হয় জীবন্ত সক্রিয়। বিবেকানন্দ নবীন বাঙ্গলার এই জাগ্রত প্রাণশক্তির বিগ্রহ। মনের কল্পলোকে নয়. চিন্তার বিলাসে নয়, জীবনে রক্তমাংসের মধ্যে সত্যকে সচল করিয়া তুলিবার প্রদীপ্ত তপস্যা হইতেছে বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ হইতেই দেশের জীবনীশক্তির, জীবনধারার মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে—বাস্তবের ব্যবহারের মধ্যে নূতন একটা সিদ্ধির প্রভা আসিয়া পড়িয়াছে। রামমোহনে যাহা ছিল অন্তরাত্মার গোপন গাঢ় উপলব্ধি, বঙ্কিমে তাহা পরিণত হইল স্বপ্নে, কল্পনায়, আশায়, আদর্শে, বিবেকানন্দে আবার তাহা দেখা দিল জীবনের অব্যর্থ প্রয়োজনরূপে প্রাণের একান্ত প্রেয়রূপে, পরম বাঞ্ছনীয়রূপে—শক্তিরূপে।

বর্ত্তমানের যুগে বাঙ্গলার যুবকমণ্ডলীর ব্যক্তিগত সাধনার ইতিহাস যদি একটু খোঁজ করিয়া দেখি, তবে সর্ব্বত্রই প্রথমে পাইব বিবেকানন্দের প্রভাব। কেবল ধর্ম্মের দিক হইতে, আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে সকলে যে এই মহাপুরুষের স্পর্শ পাইয়াছেন বা পাইতে চাহিতেছেন তাহা নয়—যে আদর্শই হৌক না—কিন্তু তাহাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজন যে সমর্থ সতেজ প্রাণ, এই সম্পদটির জন্যই বিবেকানন্দ সকল রকম সাধকের আজ নিকট অন্তরঙ্গ হইয়া আছেন।

আর ভবিষ্যতে যে বিভূতি এই প্রাণের জাগরণকে বাস্তব সিদ্ধিতে নিরেট করিয়া দাঁড় করাইবেন,

যাঁহার কল্যাণে আমাদের ব্যবহারিক জীবন পর্য্যন্ত পরম সার্থকতার ছাঁদে বাঁধিয়া উঠিতে থাকিবে এখন আমরা তাঁহারই আবির্ভাবের অপেক্ষায় কি উন্মুখী হইয়া নাই ?

বিবেকানন্দ

ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার নবজাগ্রত বীরবিগ্রহ হইতেছে বিবেকানন্দ। ভারত ভুলিয়াছিল আপনাকে, ভুলিয়াছিল সে নিজে কি, জগতে তাহার ব্রত কি; স্বরূপের স্বধর্ম্মের চেতনা হারাইয়া ভারতের অন্তর-পুরুষ মগ্ন ছিল সুপ্তির ঘোরে, নিস্তেজ নির্বীর্য্য জ্ঞানহারা হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া ভারত ডুবিয়া যাইতেছিল প্রলয়পয়োধিজলে। শুচিদন্ত শুভ্রবর্ণ বরাহ অবতারেরই মত বিবেকানন্দ এই মজ্জমান ভারতকে বীরবিক্রমে তুলিয়া ধরিলেন,— তাহাকে আত্মসম্বুদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন, জগতের সম্মুখে। অথবা তিনি যেন বৈদিক ইন্দ্র-দেবতা। পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া অস্তমিত গুহাগত দস্যু-কবলিত সূর্য্যকে ইন্দ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তুলিয়া ধরিয়াছিলেন মাথার উপরে দ্যুলোকে—আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি। তেমনি বিবেকানন্দ পৃথিবীর মানব-জাতির জ্ঞানসূর্য্য যে ভারত তাহাকে অধঃপতনের গহন তমোগর্ভ হইতে আপন ভাস্বর-মূর্ত্তিতে বাহির করিয়া আনিলেন, স্থাপিত করিলেন স্বমহিমায়।

তাঁহার পূর্ব্বে আরও মনীষী আসিয়াছিলেন—ভারতের নবজাগরণের বার্ত্তা লইয়া, আরও কর্ম্মী আসিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ হইতেছেন ঋষি, যিনি দেখিলেন, সৃষ্টি করিলেন সেই মন্ত্র যাহার বলে ভারতের দেবত্ব জাগ্রত-বিগ্রহ ধরিয়া প্রাণবন্ত হইয়া আবির্ভূত হইল। ঋষি তিনি, যিনি একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, দৃষ্টির তেজেই যাঁহার সৃজন-প্রতিভা। বিবেকানন্দের ঋষি-দৃষ্টি সকল বাহ্য আবরণ, সকল অবান্তর প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ঋজুরেখায় পৌঁছিল গিয়া ভারতের অন্তরাত্মায়, সেই অন্তরাত্মার মহিমাকে, ভগীরথের মত, তিনি নামাইয়া আনিলেন মর্ত্ত্যলোকে—তাহাকে প্রাণের রসে, তেজে, সঞ্জীবিত স্পন্দিত করিয়া ধরিলেন। নবজাগরণের ঊষার ভোর অনেকানেক মহাপুরুষ আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের কণ্ঠে যে মুহূর্ত্তে মন্দ্রিত হইল—"জাগো মা, জাগো মা", সেই মুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া আসিল—ভারতশক্তির পূর্ণারুণ প্রকট মূর্ত্তি।

বিবেকানন্দ দিয়াছিলেন শক্তির মন্ত্র—আত্ম-শক্তির, আত্ম-প্রত্যয়ের, আত্ম-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। দুইটী কথার মধ্যে তাঁহার সমস্ত দর্শন, সমস্ত ইন্দ্রজাল—"অভী","অহং ব্রহ্ম"।

—ভয় নাই, ভয় নাই; অসীম সাহস তোমার, অসম্ভব ক্ষমতা তোমার; তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম। তোমার ভিতরের ব্রহ্ম-পুরুষে জাগ্রত হও, জান কে তুমি, কি তুমি—ক্ষুদ্রের, অল্পের, দৈন্যের, অক্ষমতার মায়া মোহ ফুৎকার দিয়া তুমি অনায়াসে ফেলিয়া দিবে। মানুষের সমস্ত সাধনা এই ব্রহ্মাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলা, যাহার লেলিহান জিহ্বা সকল আবর্জ্জনা পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লয়, মানুষের সৃষ্টিতে বিরাটের তেজোময় রূপ সব ফলাইয়া ধরে! এই ব্রহ্মাগ্নিকে জ্বালাইতে হয় কি রকমে? শ্রদ্ধা—একমাত্র শ্রদ্ধার বলে। যাহার যে শ্রদ্ধা সে তাহাই হয়। ভারতের প্রাণে, জীবনে বিবেকানন্দের কল্যাণে প্রবেশ করিল অন্তরাত্মার শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাং আবিবেশ—প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এক ব্রহ্মাগ্নি।

বিবেকানন্দের সৃষ্টি প্রাণের প্রেরণার, শক্তিধারার সৃষ্টি। বাস্তব রূপ, সুষীম সুঠাম বাহ্য বিগ্রহ সৃষ্টি করা তাঁহার কাজ ছিল না। বিবেকানন্দ তাঁহার প্রেরণা, উদ্দীপনা আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিয়াছেন, দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিতে একটা স্থায়ী আকার তাই আমরা পাই না। এই আকারের কাঠামো তিনি অনেক দিয়াছেন, রূপের

বহুল ধারা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু সে সব হইতেছে গঠনের ইঙ্গিত সঙ্কেত মাত্র, তাহার কোন একটিকে একান্ত করিয়া ধরিয়া বসিলে, হুবহু অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে আসল বিবেকানন্দকে আমরা ক্ষুণ্ণ সঙ্কীর্ণ করিয়াই ফেলিব। এমন কি, তিনি যে সব দার্শনিক তত্ত্ব দিয়াছেন, যে সব সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, যে সব আধ্যাত্মিক তথ্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে অকাট্য বলিয়া মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। কারণ বিবেকানন্দ একটা শাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে আসেন নাই, বাহ্যিক আয়তন দেহ সংগঠনের ভার তিনি গ্রহণ করেন নাই। প্রাণের মধ্যে অন্তরাত্মার অবতরণের যে প্রথম স্পন্দন, যাহা হইবে সকল বাহ্য সৃষ্টির সূত্রপাত—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—জীবনের মধ্যে জীবের আপন সত্যজীবত্বে অর্থাৎ শিবত্বে জাগরণ—উহাই বিবেকানন্দ। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আপনাতে আপনি জাগা, জীবনী-শক্তির মধ্যে অনুভব করা একটা নূতন জোয়ার। জাগিয়া কি কর্ম্ম করিতে হইবে, কি ধর্ম্মে জীবনকে জীবনের ক্ষেত্রকে সুষ্ঠুভাবে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—সেই ছক হইতেছে পরের কথা। এই পরের সমস্যা পূরণ হইবে অব্যর্থভাবে,

আগের যে অন্তরাত্মার সমর্থ জাগরণ, তাহার অব্যর্থ পরিণতির ফলে। এই পরের সমস্যা সমাধান হইতে পারে সহস্র রকমে—বিবেকানন্দ তাহার নমুনা দিয়াছেন অজস্র,—তাদের মূল্য নিরূপণ করা, তাহাদের পরস্পরের সঙ্গতি নির্দ্ধারণ করা, তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করা, তাঁহার কাজের দিক দিয়া তিনি আদৌ প্রয়োজন মনে করেন নাই। সকল বিপরীত বিশৃঙ্খল সিদ্ধান্তের মধ্যে বিবেকানন্দ বলিতে চাহিয়াছেন একটি মাত্র কথা—"নায়মাত্মা বল হীনেন লভ্য"।

বিবেকানন্দ গৃহী ছিলেন না, অথচ তিনি সন্ন্যাসীও নহেন। বিবেকানন্দ অধ্যাত্মের সাধক ছিলেন, অথচ তাঁহার স্বদেশ-প্রেম অতুলনীয়! বিবেকানন্দ ভারত-বাসীকে গীতা ছাড়িয়া ফুটবল খেলিতে উপদেশ দিয়াছেন, আবার কৌপীনবন্ত হইয়া গৈরিক পতাকা তুলিয়া ধরিতে আহ্বান করিয়াছেন। এ সব রূপই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন—রূপক হিসাবে, একটা গভীরতর সত্যের প্রতীক হিসাবে। সন্ন্যাসী হও, গৃহী হও, বিশ্বপ্রেমিক হও, স্বদেশ প্রেমিক হও—আগে মানুষ হও। বিবেকানন্দ যেখানেই দেখিয়াছেন শক্তি সামর্থ্য, আত্ম-নিষ্ঠা, আত্ম-নির্ভরতা, ব্রহ্মত্বের প্রকাশ—তাহাই বরণ করিয়া লইয়াছেন।

তিনি উপনিষদের পূজারী—তাহার হেতু ইহা নয় যে, উপনিষদের মধ্যে আছে অধ্যাত্মজগতের গভীর সূক্ষ্ম রহস্য সব, তাহার হেতু এই, উপনিষদ শক্তির অগ্নিকুণ্ড, মানুষকে ব্রহ্মত্বে জাগাইয়া তোলে, উপনিষদই দারুণ দুঃসাহসে বলে—"তৎ ত্বমসি"।

বিবেকানন্দ সিদ্ধান্তে অনেকখানি মায়াবাদী ছিলেন, কিন্তু সাধনায় ছিলেন তিনি বিরাট কর্ম্মী-পুরুষ। তাঁহার কাছে মায়াবাদ অর্থে ছিল সেই দৃষ্টি, যেখানে ক্ষুদ্রতার বন্ধন নাই, মমত্বের পিছন-টান নাই—এমন একটা অসীমতার বোধ যাহার বলে "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ", এমন একটা বিপুল অনন্তের অনুভব, যাহার বলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়—সামান্য ক্রীড়নক রূপে, হস্তামলকবৎ মানুষ যথেচ্ছা খেলিতে পারে। ব্রহ্ম তাই বিবেকানন্দের কাছে একান্ত শঙ্করের ব্রহ্ম,—নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, শূন্য, অনন্ত বলিয়াই প্রতিভাত হয় নাই। তিনি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন—শক্তিঘনরূপে, ব্রহ্ম অর্থ জীবের অন্তরাত্মার পূর্ণ মহিমা গরিমা। ব্রহ্মের নিশ্চলতাকেও প্রশংসার চক্ষে তিনি দেখিয়াছেন, কারণ সে নিশ্চলতা হইতেছে আত্মসমাহিত, পূর্ণ শক্তি। শূন্য অনন্তকেও তিনি চাহিয়াছেন। কারণ, শূন্য অনন্তে

আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতে জীব অনুভব করে একটা অপরূপ শক্তি ও সামর্থ্যের আবেগ। শক্তির একটা উৎস হিসাবেই বিবেকানন্দ ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তাঁহার ধর্ম্ম ধ্যানীর, কর্ম্মবিমুখের নহে। তিনি চাহিয়াছিলেন ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠ কর্ম্ম—Practical Vedanta.

বিবেকানন্দ ভারতকে জীবনের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের যে সনাতন অন্তরাত্মা, যে অধ্যাত্ম পুরুষ, তাহাকে জাগ্রতে সচল—জীবন্ত প্রাণবন্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের জীবাত্মায় যে ব্রহ্মময়ী শক্তি, এই পুরুষসিংহ তাহাকে সক্রিয়া করিয়া দিয়াছেন, তবে তাহাকে বাহ্য জীবনের আয়তনে রূপায়নে ফলাইয়া তুলিবার, ব্যবহারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরীরী করিয়া ধরিবার সূক্ষ্ম নিপুণ প্রয়োগ-রহস্য তিনি দিয়া যান নাই এবং এ জন্য তাঁহার কাছে যাওয়া, তাঁহাকে ভুল বুঝা।

জগতে ভারতের ব্রতও এই ভাবেই বিবেকানন্দ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ব্রহ্মশক্তির দ্বারা। আসুরিক-শক্তি-প্রণোদিত ইউরোপেও তিনি জোর দিয়াছেন ব্রহ্মের উপরে। ভারতকে পাইতে হইবে ব্রাহ্মীস্থিতি ব্রাহ্মীশক্তি—ইহাই ভারতের

অন্তরাত্মার বস্তু, ভারতের ভারতত্ব। এই বস্তুটিকেই রক্ষা করা, পোষণ করা, জগতের জন্য বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে ভারতের স্বধর্ম্ম। বিবেকানন্দ যে মানবজাতির একত্ব সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বার্ত্তা আনিয়াছিলেন, তাহার মূলও এই বস্তুটিই। দেশে দেশে কালে কালে ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান অর্থাৎ বাহ্যরূপ বিভিন্ন। কিন্তু সাধনার ধর্ম্মের ঐক্য যেখানে, সাধনার ধর্ম্মের সার যাহা, যাহাকে ধরিয়া বিশ্বমানব একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইতেছে এই সত্য—ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রাহ্মীশক্তি।

জগতের অন্তরাত্মা ভারত-শক্তি, ভারত-শক্তি হইতেছে ব্রহ্মময়ী শক্তি—তাহার অর্থ জীবের শিবত্ব, আত্মসম্বুদ্ধ ঈশ্বরত্ব, অনন্ত সামর্থ্য, মুক্ত অচলপ্রতিষ্ঠ তপঃতেজ। জগতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে, অতীতের মৃত্যু আর ভবিষ্যতের নবজীবনের সন্ধিক্ষণে একটা ভাগবত প্রাণ-শক্তির অবতরণ হইতেছে বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

রামকৃষ্ণ হইতেছেন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা—অধ্যাত্মের মূল সত্তা, অধ্যাত্মের আদি শক্তি। একদিকে ব্যামিশ্রতা প্রমাদ প্রবঞ্চনা মিথ্যা, অন্যদিকে অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস নাস্তিকতা—এহেন যুগে অধ্যাত্মের কষিত-কাঞ্চন তিনি।

পৃথিবী হইতে আধ্যাত্মিকতা অন্তর্হিত-প্রায়—ভারতে তাহা কথার কথা, এমন সময়ে রামকৃষ্ণ আসিলেন এই অধ্যাত্ম বস্তুকে লইয়া—দিলেন তাহাকে তাহার চিরন্তন নিশংসয়তা, তাহার অভ্রান্ত স্বরূপ।

নানা আবর্জ্জনার ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া, যাবতীয় অবান্তর কাটিয়া, ছাঁটিয়া আধ্যাত্মিকতার সার যেটুকু রামকৃষ্ণ তাহাকে ব্যক্ত করিলেন—খাঁটি নির্জ্জলা আধ্যাত্মিকতা, ইহাই রামকৃষ্ণ।

অধ্যাত্মিকতার প্রথম কথা হইল এই যে ইহা একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি, সাক্ষাৎকার—সত্যকে দেখা, ভগবানকে পাওয়া। ইহা শুধু ধারণা নয়, মতবাদ নয়, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নয়—ইহা জাগ্রত অনুভূতি, প্রতীতি।

দার্শনিকেরা পণ্ডিতেরা আত্মার ভগবানের অস্তিত্ব "প্রমাণ" করিতে সচেষ্ট, যুক্তির সহায়ে, ন্যায়ের সূত্র ধরিয়া ; কিন্তু আত্মাকে ভগবানকে ঐ ভাবে প্রমাণ করিতে যাওয়া (বা অপ্রমাণ করিতে যাওয়া) হাস্যকর ব্যাপার। তুমি যে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তোমাকে কি আমি প্রমাণ করিতে যাই ? কি, আমি যে আছি, আমাকেই প্রমাণ করিতে বসি ? যাহা সত্য তাহা সৎ অর্থাৎ আছে বলিয়াই সত্য, আত্মার ভগবানের অস্তিত্ব, সত্যের সত্য সতঃসিদ্ধ—উহা প্রত্যক্ষের, দৃষ্টির, অপরোক্ষানুভূতির বস্তু।

আধ্যাত্মিকতা হইতেছে এই স্থূল জগতেরই মত একটা বাস্তব জগৎ, ইহা চেতনার ভিন্ন একটি আয়তন। ইহার কিছু হদিস পাইতে হইলে, এখানে উঠিয়া আসিতে হয়, পৃথিবীর ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া সম্পূর্ণ ভাবে এখানকার বাসিন্দা হইতে হয়, অর্থাৎ জীবনের এক ক্ষেত্রে নয়, আধারের এক অঙ্গ দিয়া নয়, সমগ্র জীবনকে সমস্ত আধারকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় ঐ একই লক্ষ্যের সেবায় সাধনায়।

সত্যকে আত্মাকে বা ভগবানকে জানিতে হইলে তাহাকে পাইতে হয়, তাহাতে ডুবিয়া যাইতে হয়, তাহাই

হইতে হয়—উপনিষদ যেমন বলিতেছেন, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম এব ভবতি। এই "হওয়াই" অধ্যাত্মের আসল রহস্য—কিছু "করা" পর্য্যন্তও নয়। মানুষ তাহাই করে, যাহা তাহার অন্তরাত্মার প্রকাশ; বাহিরে তেমন ভাবে সে চলা ফিরা করিবে, ভিতরে সে যেমনটি হইয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন মানুষ খায় যা, ঢেকুর তোলে তেমনি।

পৃথিবীতে কাজ করিবার জন্য হয়ত আমরা আসিয়াছি, কিন্তু তাহার আগে, ভগবানকে পাইতে হইবে। সত্যকার কর্ম্মের অধিকার তাহারই আছে, তাহারই কর্ম্ম সার্থক যে ভগবানের চাপরাশ পাইয়াছে। রামকৃষ্ণের সাধনার মধ্যে দেখি "ভাবের" সমাধির উপর বিশেষ জোর পড়িয়াছে; ইহার অর্থ বহির্মুখী সত্তাকে, বিষয় প্রমত্ত চেতনাকে অন্য দশদিক হইতে ফিরাইয়া একমাত্র অমিশ্র বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম বস্তু যাহা, তাহাতে একাগ্র, "শরবৎ তন্ময়" হওয়া।

আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা কতই না অবান্তর জিনিষ বুঝিতে শিখিয়াছি, প্রথমত সাধারণের মতে আধ্যাত্মিক বা যোগী বা সাধু তিনি, যিনি লাভ করিয়াছেন অলৌকিক ক্ষমতা কিছু, জলের উপর অবাধে যিনি

হাটিয়া যান, আকাশে যিনি উড়িয়া চলেন, আহার যাঁহার প্রয়োজন হয় না, অথবা আহার যিনি করিতে পারেন বিভীষণ রকম, ফুৎকারে যিনি ব্যাধি নিরাময় করেন, মুখ দেখিয়া বা নাম শুনিয়াই যিনি নাড়ীর কথা বলিতে পারেন—এই রকমের একটা গুণ দেখিলেই আমরা ভক্তিতে প্রণত হইয়া পড়ি, অষ্ট সিদ্ধি হইল আধ্যাত্মিকতার চরম, ইউরোপেও miracle দিয়াই সাধু সন্তের পরিচয় ও প্রমাণ। রামকৃষ্ণ আসিয়া এই সহজ কথাটা বলিলেন যে "সিদ্ধাই"র সাথে আধ্যাত্মিকতার কোনই সম্পর্ক নাই—বরং অনেক সময়ে সিদ্ধাই হয় আধ্যাত্মিকতার বাধা, প্রমাণ করে সত্যকার আধ্যাত্মিকতার অভাব, এই ধরণের শক্তি সব সাধককে ঋজু পথ হইতে সরাইয়া চোরাগলির মধ্যে লইয়া যায়; শক্তির বাহাদুরী নয়, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি ভগবৎ-অনুরাগ এই সকল সাধারণ পরিচিত জিনিষ গুলিই হইল আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ।

অন্যদিকে কোন একটা মতের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা নাই, ধর্ম্ম একটা বিশেষ সূত্র বা সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস মাত্র নয়। কারণ আসল ধর্ম্ম মগজের প্রত্যয় নয়, তাহা হইতেছে হৃদয়ের আস্বাদন, অন্তঃস্থলের অনুভব।

আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কোন মতবাদের মধ্যে তাঁহার উপলব্ধিকে প্রকাশ করিতে বা বাঁধিয়া দিতে নাও পারেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হইবে না। আবার অনেকের ধারণা আধ্যাত্মিকতা অর্থ ব্রত নিয়ম ক্রিয়া অনুষ্ঠান শীল সদাচার—ইহাও সত্য নয়। এই সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ নাই। অধ্যাত্মের সাধক ইহাদের সাহায্য লইতে পারেন প্রয়োজন মত—কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইহাদের অনেক উপরে, ইহাদের অপেক্ষা ভিন্ন রকম জিনিষ।

রামকৃষ্ণের নামের সহিত একটি জিনিষ সর্ব্বদাই জড়িত—তাহা হইতেছে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। রামকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু কথাটিতে কতকটা এই রকমের ধারণাও হয় যে প্রত্যেক ধর্ম্মের সত্যটি বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধে একটা মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে। রামকৃষ্ণের কাজ কিন্তু ঠিক এই রকমের ছিল না। প্রত্যেক ধর্ম্মকে ধরিয়া ধরিয়া চলিলে পরিণামে একই স্থানে পৌঁছিতে হয়, প্রত্যেক অধ্যাত্ম-সাধনা—বাহিরে তাহাদের রূপ যতই বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হোকনা কেন—মূলত ঠিক একই সত্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছে এবং একই সত্যকে

লাভ করিতেছে—সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় ঠিক নয় কিন্তু এই যে একত্ব তাহা রামকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে পার্থক্য দাঁড়ায় অধ্যাত্মকে ভগবানকে লইয়া নয়—কিন্তু অধ্যাত্মের ভগবানের নামে বা পরিবর্ত্তে যখন অন্য কিছুকে পূজা করি। দেহগত কোন সিদ্ধি, প্রাণস্তরের কোন ঐশ্বর্য্য, মনের কোন প্রত্যয় বিশেষকে যখন ইষ্ট করিয়া লই তখনই সত্যকার অধ্যাত্মের পথ ছাড়িয়া ভিন্নতর দেবতার বা ভূত প্রেতের সেবক হইয়া পড়ি। দেহের প্রাণের মনের উপরে হইতেছে অধ্যাত্মের রাজ্য—ভগবানের স্বরূপ। এই চতুর্থ লোকের সত্য ও ধর্ম্ম লইয়াই ভগবদসিদ্ধি, খাঁটি আধ্যাত্মিকতা।

রামকৃষ্ণের আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে একটা সহজ সরল "কাণ্ডজ্ঞানের" দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন ও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাধারণত ভাবভোলা বাহ্যবুদ্ধিশূন্য বলিয়াই অনেকখানি চিত্রিত করা হয়। কিন্তু বাহিরের চলন বলনে বা অশনে বসনে যাহাই হোক—তাঁহার সাধনাগত চেতনায় ও কর্ম্মের ধারায় ছিল একটা স্বচ্ছ এবং কঠিন বস্তুতান্ত্রিকতা। ভাবের রোখ, কল্পনার ধোঁয়া, কূটতর্কের জাল সত্যকে বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখে;

সত্যের স্থানে একটা সত্যাভাস বা একান্ত অবাস্তর জিনিষ গড়িয়া তোলে। সাধারণ জীবনে সফলতার জন্য যতখানি কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োজন, ভিতরের চেতনার জগতেও সিদ্ধির জন্য দরকার ততখানিই কাণ্ডজ্ঞান অর্থাৎ বস্তুর জ্ঞান। একটা সহজ সজাগ বস্তু-জ্ঞান রামকৃষ্ণের ছিল, তাই অধ্যাত্মবস্তুর নামে অন্য কিছু তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া যাইতে পারে নাই—কোন রকম ফাঁদে ফেলিতে পারে নাই। ইহারই কল্যাণে আবার স্থূল জগতের সহিত অধ্যাত্মের নিবিড় মিল একটা তিনি ঘটাইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখি যাঁহারা অত্যধিক আধ্যাত্মিক তাঁহারা আধিভৌতিক জগতের সহিত সহজ সম্বন্ধ রাখিতে, যথাযোগ্য আদান প্রদান করিতে অক্ষম অপটু। রামকৃষ্ণ তাঁহাদের দলে নহেন। সাধু হইতে হইলে যে বোকাও হইতে হয়, এই আদর্শ রামকৃষ্ণের ছিলনা।

(২)

বৈজ্ঞানিক যুগে, আধুনিক শিক্ষা সভ্যতার মাঝখানে, পৃথিবীতে জড়বুদ্ধির নাস্তিকতার নাগরিকতার বন্যা যখন বাড়িয়া ফুলিয়া সর্ব্বগ্রাসী হইয়া চলিয়াছে, ঠিক তাহারই মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব—তিনি আসিলেন তাঁহার অনাধুনিক, অসংস্কৃত, "অনালোকিত" গ্রাম্যতা লইয়া। কারণ তাঁহার জীবন দিয়া এই কথা প্রমাণ করিতে হইবে—মানুষের পক্ষে আর সব জিনিষ অবান্তর গৌণ, মুখ্য হইতেছে তাহার অন্তরস্থ ভগবান—তমেবৈকং জানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। বাহিরের শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি নৈপুণ্য বৈদগ্ধ্য যতই বড় হৌক, সে সকলের চেয়েও বড় জিনিষ আছে, যাহার কাছে ঐ সমস্ত অকিঞ্চিৎকর নিষ্প্রভ, এমন কি তাহাদের কিছুই না থাকিলেও, কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, যদি থাকে সেই এক বস্তুর বস্তু।

তাই দেখি সকল রকমে আধুনিক ছিলেন যিনি—যিনি জন্মিয়াছিলেন, বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, শিক্ষিত হইয়াছিলেন একান্ত আধুনিক আবহাওয়ার মধ্যে—এমন এক মহাপুরুষ তাঁহার আধুনিকতার সকল বিভব এই

সরল গ্রাম্যতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিলেন, তাঁহাকে বলিতে হইল—শিষ্যস্তেঽহংশাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং। শুধু তাই নয়, ইহারই অদ্ভুত অমিত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বজ্রের মত গিয়া পড়িলেন সেই দেশে যেখানে আবার আধুনিকতা পাইয়াছে তাহার পরাকাষ্ঠা। বিবেকানন্দের মধ্যে পরম আধুনিকতা চরম আধ্যাত্মিকতারই সেবক ও যন্ত্র হইবার দীক্ষা লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে নিজের আধারে প্রমাণ করিলেন বাহিরের উপর ভিতরের, জড়ের উপর চৈতন্যের, অধিভূতের উপর অধ্যাত্মের বিজয়। পরে মানব-জাতির জীবনে সেই মহাসত্যের প্রতিষ্ঠা সুরু করিলেন। সমগ্র ভবিষ্য সৃষ্টির বীজ তিনি বপন করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তাই যুগসন্ধি। একটা অতীত তাঁহার মধ্যে শেষ হইয়াছে, এবং নূতন ভবিষ্যৎ জন্ম লইয়াছে। অতীতের সমস্ত অধ্যাত্ম-সাধনা তিনি যেন গ্রাস করিয়াছেন; তাহাদের যতখানি বহিরঙ্গ, যাহা কেবল বিশেষ স্থান কাল পাত্র অনুসারে পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অনিত্য, তাহা খোসা ভুষির মত ফেলিয়া দিয়াছেন, আত্মসাৎ করিয়াছেন, ভবিষ্যতের জন্য যেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন যাহা সত্যকার

সত্য, অধ্যাত্মের যাহা সার বস্তু, যাহা রসো বৈ সঃ। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সিদ্ধির মূল স্বরূপ হইল ভগবানের, পূর্ণ ভগবানের উপলব্ধি—দার্শনিক কথায়, পুরুষ ও প্রকৃতির, সৎ ও শক্তির, নিত্য ও লীলার একত্ব ও সমন্বয়। রামকৃষ্ণ নিজে যেমন বলিতেন, যাঁহার মধ্যে লীলা তাঁহারই মধ্যে নিত্য, আবার যাঁহাতে নিত্য তাঁহাতেই লীলা—লীলার ভিতর দিয়া উঠিয়া যাইবে নিত্যে, আবার নিত্য হইতে নামিয়া আসিবে লীলায়, মায়া হিসাবে নয়, নিত্যেরই প্রকাশ হিসাবে। রামকৃষ্ণ নিজে তাই ছিলেন শক্তির পূজারী, মায়ের ছেলে—মা'ই ব্রহ্মময়ী।

এই প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়াইয়াছে বিবেকানন্দের সকর্ম্ম বেদান্ত—জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ। অধ্যাত্ম আর জীবন যে পৃথক বস্তু নয়—জীবনেরই মধ্যে যে অধ্যাত্মকে প্রতিষ্ঠিত প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, এই মহাসত্য বিবেকানন্দের সকল প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল প্রেরণারূপে। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম বলিতে সাধকেরা এবং জনসাধারণও বুঝিত মোটের উপর একটা পারলৌকিক ব্যাপার, খাঁটি সাধনা যদি কোথাও মিলিত তবে তাহার লক্ষ্য ও প্রেরণা ছিল এই তত্ত্ব—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। রামকৃষ্ণ এই চলিত মায়াবাদের

ভিত টলাইয়া দিলেন যেদিন ঘোর বেদান্তবাদী তোতাপুরীকে "নেতির" পথ ছাড়াইয়া "ইতির" পথ ধরাইলেন, দেখাইলেন জগন্মাতার মহিমা। রামকৃষ্ণের এই মূল উপলব্ধিকে ধরিয়া বিবেকানন্দ ধর্ম্ম সাধনার মোড় ফিরাইয়া দিলেন—তাঁহার প্রয়াস হইল ধর্ম্মকে অধ্যাত্মকে পৃথিবীর উপরে সমাজের মধ্যে, সহজ জীবন-যাত্রায় নামাইয়া ধরিতে। রামকৃষ্ণ অন্তরে সত্যকার সন্ন্যাসী হইলেও সন্ন্যাসের ভেখ গ্রহণ করেন নাই—বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর পতাকা তুলিয়া ধরিলেও প্রাণে আচরণে ছিলেন বিপুল কর্ম্মী—যোগযুক্ত কর্ম্মী। অমিশ্র বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-বস্তুর জন্য তিনি সমাধির উপর জোর দিয়াছিলেন বটে, তবুও নির্ব্বিকল্প সমাধিকেই চূড়ান্ত সিদ্ধি বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। সমুদ্রে লবণের পুতুলের মত তিনি নিঃশেষ গলিয়া যাইতে চাহিতেন না। রামপ্রসাদের মত এক হিসাবে তিনি চিনি না হইয়া বরং চিনি খাইতে ভাল বাসিতেন—তাঁহার লক্ষ্য ছিল "কাঁচা আমি"কে দূর করিয়া শুদ্ধ করিয়া—রূপান্তরিত করিয়া—"পাকা আমি"র লীলা।

এই ধারায় চলিয়া, এই মহা উপলব্ধিকে আরও স্ফুট আরও জাগ্রত ও বাস্তব করিয়া ধরা হইল

ভবিষ্যতের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ খাঁটি আধ্যাত্মিকতার অমৃত-উৎসের মুখ খুলিয়া দিয়াছেন—বিবেকানন্দ তাহাকে চারিদিকে চারাইয়া ছড়াইয়া দিয়া একটা জীবন্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—ভবিষ্যতের রূপকার প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহার স্থূল ও স্থায়ী রূপ।

রবীন্দ্রনাথ

(১)

কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা একটু দেখিতে চাই। কবির ইহাতে কিছু আপত্তি হইতে পারে—তিনি হয়ত বলিবেন, তাঁহাকে সত্যভাবে দেখিতে হইলে কবি হিসাবেই দেখিতে হইবে, মানুষ হিসাবে তিনি কি করিয়াছেন বা না করিয়াছেন সেটা তাঁহার জীবনে অবান্তর কথা; তাঁহার যে সত্য যে স্বরূপ, তাঁহার মধ্যে শাশ্বত ও সনাতন যদি কিছু থাকে, তাহা তিনি ধরিয়া দিয়াছেন তাঁহার কাব্যে; বাকি যাহা তাহার কোন বিশেষ অর্থ নাই মর্য্যাদাও নাই—অন্যান্য অনেকের সহিত সেদিক দিয়া তাঁহার খুব বেশী পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলেও থাকিতে পারে। কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অন্য পরিচয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝা হয়, তাঁহাকে খাটো করা হয়।

কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ বলিতে আমরা একান্ত বাহিরের বৈষয়িক বা সাংসারিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতেছি না, আমরা তাঁহার ভিতরের সেই সত্যকার মানুষটিরই কথা বলিতেছি, যাহার একটা প্রকাশ হইতেছে—কবি

রবীন্দ্রনাথ। কাব্যেই হয়ত সেই মানুষটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়াছে, তবুও তাহা একটা বিশেষ বৃত্তির বা অঙ্গের প্রকাশ মাত্র। সেই প্রকাশ যে-সত্যকে যে-উপলব্ধিকে, অন্তরাত্মার যে-সিদ্ধিকে ব্যক্ত করিতে, আকার দিতে চাহিতেছে তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এবং সকলের চেয়ে বড় কথা হইতেছে "সৌন্দর্য্য"—তিনি দেখিতেছেন সুন্দরকে এবং দেখাইতেছেন সেই সুন্দরকে সুন্দরভাবে। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর—প্রকৃতির রাজ্যে হউক আর অন্তরের রাজ্যে হউক. কায়ে হউক মনে হউক বাক্যে হউক তিল তিল করিয়া সকল স্থান হইতে সকল সৌন্দর্য্য কুড়াইয়া লইয়া তিনি কাব্যের গড়িয়াছেন তিলোত্তমা মূর্ত্তি। তাঁহার ভাষা সুন্দর—শব্দের লালিত্য, ছন্দের লাস্য তাঁহাতে পাইয়াছে বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। তাঁহার ভাব সুন্দর—চিন্তার বৈদগ্ধ্য, অনুভবের সৌকুমার্য্য অতি বিচিত্র ও মনোহর। তাঁহার আখ্যানের বিষয় ও বস্তু নিজে নিজেই সুন্দর; শব্দের অলঙ্কার, অর্থের অলঙ্কারে—মণ্ডনের উপর মণ্ডন দিয়া—তাহাকে আবার অধিকতর অলঙ্কৃত সুন্দর করিয়া তিনি ধরিয়াছেন।

তাঁহার

ঝরিছে মুকুল, কুজিছে কোকিল
যামিনী জোছনা মত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,—
এসেছি বাসবদত্তা।"

অথবা

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

কি একটা অপরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যের কল্পলোকই না উন্মুক্ত করিয়া ধরিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরের আসল মানুষটি হইতেছে এই ঐন্দ্রজালিক রূপকার। সর্ব্বতোভাবে সুরূপের সৃষ্টি—ইহাই তাঁহার অন্তর পুরুষের ধর্ম্ম, তাঁহার স্বভাবের নিত্যসিদ্ধি। জ্ঞানের দিক দিয়া, শক্তির দিক দিয়া তিনি যত উপরে না উঠিয়াছেন, তাহাও ছাড়াইয়া

গিয়াছেন তিনি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। জ্ঞান বা শক্তি তাঁহাও চেতনার মধ্যে নিম্নতর স্থান পাইয়াছে, উহারা হইয়া আছে সৌন্দর্য্যের অনুগত সেবক।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরপুরুষটি আসিয়াছে যেন এক গন্ধর্ব্ব লোক হইতে। এই গন্ধর্ব্ব পৃথিবীতে অবতীর্ণ, পার্থিব জীবনে প্রকৃত সুন্দরের কিছু প্রসার করিয়া দিতে। সৌন্দর্য্যকে সকল রকমে ব্যক্ত করাই তাঁহার ব্রত ও ধর্ম্ম। সুন্দর কাব্য অনেকে রচনা করিয়াছে—সুন্দরের উপরও অনেকে কাব্য রচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবি-শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তাঁহার অন্তরস্থ কবি-পুরুষ তাঁহার সমগ্র সত্তা ছাইয়া রহিয়াছে। তিনি কাব্য যদি কিছু নাও লিখিতেন, তবুও তাঁহার জীবনটিই একখানি সুন্দরের জীবন্ত কাব্য হইয়া থাকিত। নিজে তিনি সুদর্শন—তাঁহার বাক্য সুন্দর, তাঁহার ব্যবহার সুন্দর,—তাঁহার কর্ম্ম সুন্দর, তাঁহার ধর্ম্ম সুন্দর।* নিজে চারিদিকে

* এখানে মনে পড়িতেছে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার রামেন্দ্র-সুন্দরকে যে কথায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—"তোমার, হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর হে রামেন্দ্র সুন্দর—"।

সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের অভিমুখে চলিয়াছেন।

বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের অন্তর পুরুষ হইতেছে রূপকার। কিন্তু এই রূপ তিনি আকারের সৌষ্ঠব অপেক্ষা বিশেষ ভাবে ধরিয়াছেন ছন্দের স্পন্দনে। সৌন্দর্য্যের গঠন অপেক্ষা গতি, বলন অপেক্ষা চলনের উপরেই দেখি তাঁহার কারুকার্য্যে বেশী জোর পড়িয়াছে। তাঁহার কাব্য সৃষ্টিতে তাই স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য রীতির অপেক্ষা বেশী পাই সঙ্গীতের নৃত্যের রীতির প্রভাব। সুন্দরকে তিনি লাভ করিয়াছেন—স্থিতি নয়, গতির ভিতর দিয়া—দর্শন নয়, শ্রবণের ভিতর দিয়া। যে প্রাণের স্পন্দনে এই সৃষ্টি বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, বাহ্য আকারের বা কাঠামোর পিছনে যে নিভৃত আবেগ উদ্বেলিত, কবি কান পাতিয়া তাহারই ছন্দ, তাহারই সুর শুনিতে ধরিতে চাহিতেছেন। কবি চাহিতেছেন অর্থের অন্তরালে রহিয়াছে যে ব্যঞ্জনা তাহাকে, স্থূল বাক্যের অন্তরে রহিয়াছে যে অশরীরী ভাব তাহাকে। কবি তাই বলিতেছেন—

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,

কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।

আরও

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে—

তাই দেখি রূপের আকার যেখানে রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন, সেখানেও রূপকে স্থির করিয়া, সমাধির বিষয় করিয়া তিনি ধরেন নাই। তিনি দিয়াছেন রূপের চলমূর্ত্তি,— এই যেমন,

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—

নৃত্য, ছন্দায়িত গতির মূর্চ্ছনাই দিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্য্যের রূপায়ন। কালিদাসের কাব্যসুন্দরী সম্বন্ধে আমরা মোটের উপর বলিতে পারি—'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে দেখি—

শব্দময়ী অপ্সর রমণী
গেল চলি, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

তবে রহস্যের কথা এই যে, কবির শব্দময়ী

অনুপ্রেরণা স্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়াও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। সৌন্দর্য্যের এই যত নৃত্য, এই যত ঝঙ্কার, ইহাদের বাঁকে বাঁকে কি একটা ভাবের ঘোর, সুরের লয় এমন মীড় টানিয়া চলিয়াছে যে, মনে হয় যেন তাহারা সব ফিরিয়া একটা শান্তির ও স্তব্ধতারই তটে গিয়া মিলিয়া যাইতেছে। কবির মুখরতা যেন মৌনতারই সহিত কোলাকুলি করিয়া আছে। এক দিকে দেখি রসলিপ্সু প্রাণ প্রকৃতির বর্ণে গন্ধে হাস্যে হাস্যে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্যে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসু ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহিরের বস্তুসম্ভারের বৈভবের দিকে পরম আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আত্মাকে ভগবানকেও তাই তিনি ধরিতে চাহিতেছেন—যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রাণের আলিঙ্গনে। তবুও অন্য দিকে দেখি এই সকলেরই মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য চলিয়া গিয়াছে—

অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান।

স্থূল শব্দের, রূঢ় গতায়াতের, হুলস্থূলের জগৎ লইয়া খেলিতে খেলিতেই তিনি ভাবে ও ভঙ্গীতে তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছেন একটা সূক্ষ্মতর লোকে, যেখানে সুর ছন্দ যেন সবে জন্মগ্রহণ করিতেছে—সুর ছন্দ সেখানে কথার রূপের ভারে জড়ের অতি-স্পষ্টতা পায় নাই,

তাহাতে মাখা আছে একটা শুচিতা, স্বচ্ছতা, লঘুতা, লালিত্য, লাবণ্য—সেখানে

কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
*　　　*　　　*
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে—

কবির আকাঙ্ক্ষা তাই হইতেছে—

যে গান কানে যায় না শোনা *
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে।

* এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে কীট্‌স'-এর "heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter."—

ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের মত কীট্‌সও ছিলেন একান্ত সৌন্দর্য্যেরই পূজারী, তবে ইংরেজ-কবি সৌন্দর্য্যকে কান দিয়া শুনা অপেক্ষা চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন বেশী—তাঁহার melodies গতির স্পন্দন অপেক্ষা ফুটাইয়া ধরিতেছে স্থির রূপ; সঙ্গীত বা নাট্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বে পাই বিশেষ ভাবে চিত্রের রীতি। গতি, সুর, ছন্দের সূক্ষ্ম সুনিপুণ লাস্য রবীন্দ্রনাথের মত প্রাধান্য পাইয়াছে শেলীর কাব্য-প্রতিভায়।

৫

এ যেন প্রাচীন গ্রীকেরা যাহাকে বলিতেন music of the spheres, সেই জিনিষের মত কিছু ; এখানে পাই সৌন্দর্য্যের আদি আবেগ, মূল ছন্দ। মনে হয়, প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সৃষ্টি যখন রূপ গ্রহণ করিতে সুরু করিল—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—উপনিষদের এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রায়ই তিনি এটি উল্লেখ করিয়া থাকেন—তখনকার সেই প্রথম দোল, সেই প্রথম তান, সেই নাদব্রহ্মই যেন রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট ; এবং এই ইষ্টের সাধনায় অপরূপ সাফল্যই তাঁহার কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা—এই ইষ্টের ধ্যান-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ দিতেছেন এই মন্ত্রে—

সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু
নীরবতায় বাজ্‌ছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

(২)

সত্যের সাধনা আছে, মঙ্গলের সাধনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য ও মঙ্গল সাধনার বস্তু, তাহাদের প্রেয়ের, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। সত্যের সত্যতার জন্য তিনি সত্যের ততখানি উপাসক নহেন; মঙ্গলের মাঙ্গল্যের জন্যও তিনি মঙ্গলের পূজারী নহেন। কিন্তু সত্যকার সত্য আবার সত্যসত্যই সুন্দর; পরম মঙ্গল আবার পরম সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই সত্য ও মঙ্গল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, প্রেমের মানুষ—বৈষ্ণব সাধকেরা যাহাকে বলেন "সুপুরুষ"। কিন্তু তাঁহার প্রেমও হইতেছে সৌন্দর্য্যেরই সার। কবির প্রেম তাই কবিকে বলিতেছে—

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান,
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান;
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা—

প্রেমকে কেবল প্রেম-হিসাবে তিনি ততখানি উপভোগ করেন নাই বড়ু চণ্ডীদাস যেমন করিয়াছিলেন; প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য্য আসিয়া পাইয়াছে চরম অভিব্যক্তি, পরাকাষ্ঠা, তাই তিনি প্রেমিক হইয়া গিয়াছেন। অতি-আধুনিক অনুভূতি প্রেমকে সৌন্দর্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে, বরং অসুন্দরেরই সহিত তাহার একটা মিলন ঘটাইতে চাহিতেছে, রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে পরম প্রাচীন, সনাতনপন্থী।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য হইতেছে সামঞ্জস্য, সমন্বয় সুসঙ্গতি, প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা, প্রশান্তি। বিরোধ যেখানে, রুক্ষতা রূঢ়তা যেখানে, সেইখানেই সৌন্দর্য্যের অভাব—সেখানে ছন্দের পতন হইয়াছে, তাল কাটিয়া গিয়াছে, সুর ভাঙিয়াছে, চলনের বলনের দোষ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভগবান তাই হইতেছেন

সুন্দর বল্লভ, কান্ত

এবং

তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।

এই বল্লভের কাছে কবির নিত্যকার আকিঞ্চনও তাই

নির্ম্মল কর উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে

এবং

এ জীবনে যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে।

ভগবান ভগবান, কারণ, তিনি নিখিল বিশ্বের মিলনের সূত্র—

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি আসিয়াছে এই মিলনের বা মিলের যে সৌন্দর্য্য তাহার আকর্ষণে। সমস্ত সৃষ্টি "আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ" বরণীয় লোভনীয়; কারণ তাহার ভিতর দিয়া এক পরম মধুর ঐক্যতান ঝরিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের মহামানবের আদর্শও আসিয়াছে এই ঐক্যতানের অনুপ্রেরণায়। পৃথিবীর সকল দেশ জাতি তাহাদের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য লইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইবে—মানব-সমাজ এই ভাবে পাইবে একটা সুঠাম সৌন্দর্য্য। মানুষের মধ্যে সমানে সমানে দেখি যে রেষারেষি আবার নীচের প্রতি উপরের যে অত্যাচার আর উপরের প্রতি নীচের যে দাসভাব—সাধারণ ভাবে, মানুষের এই ধরণের যাবতীয় হীনবৃত্তিই পরিত্যজ্য; কারণ, তাহা

কর্কশ, অসুন্দর, কুৎসিত। শান্তি, প্রীতি, ঔদার্য্য, সৌহার্দ্দ্যই মানুষকে, ব্যক্তি-হিসাবে ও গোষ্ঠী-হিসাবে, সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতারও মূলে রহিয়াছে এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। দাসত্বের মধ্যে যে শ্রীহীনতা, তাহাই তাঁহাকে বেশি পীড়া দেয়। দারিদ্র্যের স্থূল অভাবটি অপেক্ষা তাঁহার কাছে অধিক অসহ্য দারিদ্র্যের কুরূপ। মহাত্মা গান্ধীর মত তিনি যদি অভাবকে অভাব-হিসাবেই একান্ত করিয়া দেখিতে পারিতেন, তবে হয়ত না-হউক একটি বারের জন্যও চরকায় হাত দিলেও দিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে স্বচ্ছলতা নিজে নিজেই কিছু সার্থক নয়; স্বচ্ছলতা সার্থক, যদি তা হয় সুছন্দ। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাই ভাঙ্গন অপেক্ষা গড়নের উপর বেশী জোর দিয়াছে, বিদেশীর সহিত কলহ-কোলাহল অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করা, শত্রুকে গিয়া আক্রমণ অপেক্ষা নিজের ঘর সামলান, সারান ও সাজানকেই তিনি আসল কাজ বলিয়া বিবেচনা করেন—গড়ন অর্থ সৃষ্টি করা, তাহার অর্থ সুন্দর করিয়া রচনা করা। জাতির সমবেত জীবনের সকল অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিয়া, ঐক্যবদ্ধ করিয়া,

তাহাতে রূপগত সৌষ্ঠব ও কর্ম্মগত ছন্দ দেওয়াই হইল তাঁহার স্বদেশী-সমাজের আদর্শ।

তাই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সুন্দর কাব্য ও সুন্দরের কাব্য যে রচনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৃষ্টি হইতেছে, তিনি বাস্তবে, আমাদের জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রভাব কিছু নামাইয়া আনিয়াছেন, বিশেষত আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে, আমাদের বাংলা দেশে। নিজের কাব্য-সৃষ্টির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায় নাই। প্রথমত, তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারু-শিল্পের একটা জগৎ, নূতন একটা ধারা; দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রাণের স্পন্দনে আমাদের সারা দেশে একটা সুকুমার রুচি ও অনুভূতি—একটা সৌন্দর্য্যমুখী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে; তৃতীয়ত, যে জিনিষটী এক হিসাবে আরও অর্থপূর্ণ আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে, আমাদের বসনেভূষণে, আলাপে ব্যবহারে, গৃহে মজলিসে, বাস্তবের উপকরণে ও প্রয়োগে একটা নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য যদি ক্রমশঃ দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার মূলে—সাক্ষাতে হউক আর অসাক্ষাতে হউক—রবীন্দ্রনাথের

প্রভাব অনেকখানিই রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালীই যা হউক একটু সৌন্দর্য্যরসিক বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। এই খ্যাতি ঠাকুর বাড়ীর কল্যাণে যে অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক কালে আমরা কি ছিলাম, জানিনা; হয়ত আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধ বিশেষভাবে ছিল ভাবের অন্তরের, বড় জোর শিল্পের জিনিষ; বাহিরের জীবনে পর্য্যন্ত—জপানীদের মত—সৌন্দর্য্যকুশলী জাত আমরা কখনও ছিলাম কিনা সন্দেহ। তবুও ভিতরে বা বাহিরে যতটুকু সম্পদ বা সিদ্ধি ঐ বিষয়ে আমাদের ছিল তাহা নানা কারণে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

প্রাণশক্তির অভাব, বৈরাগ্য, দৈন্য, নৈরাশ্য তামসিকতা, একটা বিপুল হেলাফেলা, ঘোর বিশৃঙ্খলতা আমাদের জীবনের রূপায়নকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষে, যে প্রভাব রবীন্দ্রনাথে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, বিশেষমূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহাই আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিল, খুলিয়া দিল নূতন সৌন্দর্য্য স্থষ্টির ধারা।

কেবল আমাদের দেশেরই কথা বলি কেন, কেন

বাংলায় বা ভারতবর্ষের মধ্যেই এই প্রভাবকে আবদ্ধ রাখিতে চাই কেন? আমার বিশ্বাস, ইউরোপে—পাশ্চাত্যে—রবীন্দ্রনাথ যে এতখানি আদর পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিত্বের জন্য প্রাধানত নয়। কলকারখানার, যান্ত্রিকতার, রূঢ় প্রয়োজনের শ্রীহীন জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করিতেছে কোন একটা শান্তির ও শ্রীর নিকেতনে।

জগদীশ চন্দ্র

জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক—"সায়েনটিষ্ট"; তাঁহার ক্ষেত্র জড়-জগৎ—তাঁহার কাজ স্থূল বস্তু সম্বন্ধে স্থূল উপায়ে সত্য আবিস্কার। সত্যকে হাতে কলমে প্রমাণ করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—স্থূল ইন্দ্রিয় যাহাকে ছুঁইতে না পারে তেমন সত্যকে সত্য বলিয়া না মানাই হইল তাঁহার স্বধর্ম্ম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের পর্য্যবেক্ষণ আর বুদ্ধির পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ—ইহাই হইল বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত অনুমোদিত জ্ঞানের যন্ত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা হইলেন যুক্তিবাদী (rationalist); ইন্দ্রিয় এবং মন বা তর্ক-বুদ্ধিকেই তাঁহারা ধরিয়া চলেন। সত্যের অনুসন্ধানে অন্য বৃত্তির উপর তাঁহাদের আস্থা নাই; কারণ অন্যান্য বৃত্তি পড়ে অনুমানের কল্পনার—কবিত্বের পর্য্যায়ে। বিজ্ঞান চাহে সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান; বৈজ্ঞানিক চলিবেন নিরেট বা নির্জ্জলা মস্তিষ্কের নির্দ্দেশে—আর কোন রকম বৃত্তিকে আশ্রয় করা তাঁহার পক্ষে ভয়াবহ। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকের কারবার হইল একান্ত স্থূল জগতের সহিত; এই ক্ষেত্রের তত্ত্ব বা তথ্যের

উদ্ঘাটনের জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বিচার বা যুক্তিই যথেষ্ট—আর কাহারও দুয়ারে যাইবারও প্রয়োজন নাই।

অবশ্য সায়েনটিষ্ট যিনি, তিনি আবার কবি ভাবুক আধ্যাত্মিক হইতে পারেন—কিন্তু তাহা হইল সম্পূর্ণ অন্য ক্ষেত্রের, ভিন্ন জগতের কথা। সায়েনটিষ্ট যখন সায়েন্সে ব্যাপৃত তখন তিনি তাঁহার ঐ অন্য দিকটির দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবেন। দুইয়ের সংযোগে হয় গোলমালের সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইতে হইবে মস্তিষ্কের, ইন্দ্রিয়ের কড়া পাহারায়—তাহাতে যদি আসিয়া পড়ে হৃদয়ের প্রাণের কল্পনার আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভব তবে সায়ান্সের পরিবর্ত্তে গড়িয়া উঠিবে রোমান্স—উপকথা। এডিংটন বা লজ এত বড় বৈজ্ঞানিক হইয়াও এই দোষ হইতে মুক্তি পান নাই। বিজ্ঞানের মধ্যে তাঁহারা বিজ্ঞানেতর জিনিষ কেবলই আনিয়া মিশাইয়া দিতেছেন। এই হইল গোঁড়া বৈজ্ঞানিকের মনোভাব বা দৃষ্টি-ভঙ্গী। সাধারণ বিজ্ঞান-ভক্তেরাও হয়ত এই কথাই সমর্থন করিবেন।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে চলিত শাস্ত্র এই বটে—কিন্তু বাস্তবে কার্য্যতঃ দেখি ঘটে অন্য রকম। জগদীশ-চন্দ্রের বিশেষত্ব তিনি বৈজ্ঞানিক—খাঁটি বৈজ্ঞানিক

হইয়াও, আবার "কবি" ; আর এই "কবিত্ব" তাঁহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বৃত্তি হইতে পৃথক একটা বস্তু নয়—পৃথকত নহেই, উহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উৎস ও রহস্য, নিভৃত শক্তি। কবি অর্থ অবশ্য বাক্য-রচয়িতা নয়, কবি অর্থ যাঁহার আছে দিব্যদৃষ্টি এবং এই দিব্য দৃষ্টির জোরে যিনি করেন সৃষ্টি। এই শক্তিটির কল্যাণেই জগদীশচন্দ্রকে সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা যাদুকর বলিয়া বেশি মনে হয়। অবশ্য একা এক জগদীশচন্দ্রই যে এই হিসাবে অতুল অদ্বিতীয় তাহা নয়। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও স্রষ্টা যাঁহারা তাঁহাদের সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঐ শক্তির পরিচয় পাই—কারণ সকল সৃষ্টির মূলে থাকিতে বাধ্য এই দৃষ্টি। গেলিলিও হইতে আইন ষ্টাইন অবধি সকল আবিস্কারকের মস্তিষ্কেই খেলিয়াছে একটা ইন্দ্রিয়াতীতের, মানসাতীতের দৃষ্টির জ্যোতি। তাঁহাদের সকল কৃতিত্বই—অন্ততঃ জগদীশ-চন্দ্রের সকল কৃতিত্ব হইল এই দৃষ্টিকে ইন্দ্রিয়ের মনের কাঠামের মধ্যে নামাইয়া কিরূপে প্রমাণিত পরিচিত গোচর করিয়া ধরিয়াছেন।

দিব্যদৃষ্টি কাহাকে বলি? দিব্যদৃষ্টি অর্থ একাত্মানুভূতি—কোন বস্তুর সত্য যখন লাভ করি সেই বস্তুর সহিত

একাত্ম হইয়া। ইহার অন্য নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা—অর্থাৎ যাঁহারা স্রষ্টা নহেন কিন্তু স্মার্ত্ত মাত্র, যাঁহারা কেবল বা বেশীর ভাগ ভাষ্যকার, ব্যবস্থাপক, তাঁহারা—এই বৃত্তিটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বলিয়াছি ইহার উপর তাঁহাদের ভরসা নাই, কারণ ইহার উপর কর্তৃত্ব বা অধিকার তাঁহাদের কিছু নাই। তাঁহাদের হইল পরোক্ষ জ্ঞানের সহজ পরিচিত পথ। তাঁহারা চলেন বিশেষ উদাহরণ হইতে ক্রমে সাধারণ সিদ্ধান্তে, কার্য্যের সূত্র ধরিয়া উঠিতে থাকেন কারণের মধ্যে, স্থূল হইতে কম স্থূলে, ইন্দ্রিয় প্রমাণ হইতে অতীন্দ্রিয় বা ধারণাগত প্রমাণে (যেমন, গণিতিক বিজ্ঞানে)। অপরোক্ষ জ্ঞানের গতি ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে জ্ঞাতা বিষয়টিকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া আপনার বাহিরে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, স্থূলরূপ ক্রমে ভাঙ্গিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুসন্ধানে চলেন না; জ্ঞাতা প্রথমেই তাঁহার জ্ঞেয়ের সহিত একীভূত হইয়া যান, তাহার সত্তায় নিজের চেতনা তাঁহার ওতপ্রোত হইয়া যায়, এক হিসাবে তিনি জ্ঞেয়ই হইয়া উঠেন—শ্রীরাধার যেমন অনুভব হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণই হইয়া

গিয়াছেন। সেই অবস্থায় বস্তুর যে সত্য যে রহস্য,যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বতঃই তাহা জ্ঞাতার জ্ঞানে সঞ্চারিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বাহিরের কোন প্রমাণকে আশ্রয় না করিয়া এই রকম ভিতর হইতে বস্তুর যে সাক্ষাৎ জ্ঞান—যদি যথাযথ পাই, তবে তাহা হয় অভ্রান্ত নিঃসন্দেহ, তাহাতে থাকে একটা পরিপূর্ণতার অখণ্ডতার ছন্দ।

জগদীশচন্দ্র সত্যকে ধরিতে পাইয়াছেন যে খুরধার বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়গত সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণার সহায়ে তাহা নয়—এই দুই বৃত্তি তাঁহার মধ্যে যতই প্রচুর থাকুক না কেন। তিনি তাঁহার জগতের সহিত—জড়ের, বিশেষভাবে উদ্ভিদ লোকের সহিত—স্থাপন করিয়াছেন একটা একাত্মতা, সত্তার চেতনার ঐক্য ; এবং তাহারই ফলে তাঁহার মনে প্রতিফলিত হইয়াছে সেই জগতের সত্য ও তথ্য। তবে তাঁহার কৃতিত্ব—হয়ত ইহাকেই বলা যায় খাঁটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব—এই সকল অন্তর্জ্ঞান-লব্ধ সত্যকে তথ্যকে তিনি পরীক্ষা করিয়া, যাচাই করিয়া সাজাইয়া স্পষ্ট স্ফুট করিয়া দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন হাতে কলমে—স্থূল মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সহায়ে, স্থূলতম যন্ত্রাদির সহায়ে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেও—স্থূল যন্ত্র প্রক্রিয়াদির উদ্ভাবনে অনুসরণে তিনি যে একটা অদ্ভুত :চাতুর্য্য, সারল্য—যাদু—দেখাইয়াছেন,

তাহাও আমরা বলি সম্ভব হইয়াছে ঐ অপরোক্ষানুভূতির কল্যাণে।

জ্ঞানের যন্ত্র বা উপায় ছাড়া জ্ঞানের বস্তু বা তথ্য যাহা জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছেন ত্যহারও বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে ঐ অপরোক্ষানুভূতির, ঐ দিব্যদৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য হইতে—তাহার মূল কথা "ঐক্য"। সমস্ত জড় এক—বৈজ্ঞানিকের কাছেও এই সত্য পুরাতন—তবে জগতের ঐক্য বা একত্ব আজকাল যে নিবিড়তা, যে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বকালে জানা ছিল না। জগদীশচন্দ্র এই জড়াত্মক ঐক্যের মধ্যে আর একটা নূতন ঐক্য-সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন, জড়াত্মক ঐক্যকে উর্দ্ধে তুলিয়া "গুণান্তরিত" করিয়া ধরিয়াছেন—জড়ের একত্ব ছাড়া সৃষ্টিতে আছে প্রাণের একত্ব ; জড় জড় নয়, তাহাতে আছে প্রাণ—জড়ের ছন্দে লুক্কায়িত জীবনেরই ছন্দ। ধাতব পদার্থেরও আছে শ্রান্তি বোধ, বিষ প্রয়োগে তাহারাও হয় মূর্চ্ছিত, মুমূর্ষু, মৃত। উদ্ভিদ ও জড় উপকরণের সমষ্টি মাত্র নয়—তাহাদেরও আছে প্রাণীর অনুরূপ নাড়ীর বা স্নায়ুর সাড়া, হৃদয়ের স্পন্দন, আছে সুখ দুঃখের বোধ—আছে অন্তঃসত্তা। জগদীশচন্দ্র জড়কে এইভাবে প্রাণের মধ্য দিয়া প্রায় চৈতন্যের দুয়ারে লইয়া গিয়াছেন।

আমাদের সুপ্রাচীন আর্যদৃষ্টি তাঁহার প্রতিভায় আজ ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া উঠিতেছে।

যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা নানা নয়—তাহা এক। সেই এক, জড় বা অন্নময় নয়, তাহা প্রাণময়, তাহা জীবন্ত—তাহা আবার জীবন্ত কেবল নয় তাহা সচেতন। দিব্য-দৃষ্টিতে, অন্তরাত্মার অভিজ্ঞায় ঋষি যে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ কি রকম প্রমাণ কি রকম, স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের ছন্দ কি প্রকারে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে,সৃষ্টির "অধ্যাত্ম"-সত্তা যে সৃষ্টির ওপারে বা বাহিরে আপনাকে লুকাইয়া রাখে নাই পরন্তু অধিভূতের মধ্যে আপনাকে সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, উহারই প্রভা যে ইহাকে প্রভান্বিত করিয়াছে—তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—জগদীশচন্দ্র এই বিজ্ঞান কথঞ্চিৎ আমাদের সাধারণ প্রত্যয়ের স্থূলদৃষ্টির গোচর করিয়া ধরিয়াছেন।

এই ভাবে জগদীশচন্দ্রেও আমরা পাইতেছি যুগোপযোগী একটা গভীর ও বৃহৎ সামঞ্জস্যের, মিলনের, ঐক্যের বার্ত্তা—একদিকে প্রাচী ও প্রাচীন অন্য দিকে পাশ্চাত্য ও আধুনিক, একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত অন্যদিকে ইন্দ্রিয়—একদিকে অধ্যাত্ম অন্য দিকে অধিভূত এই যুগ্ম সত্যের সেতু-বন্ধ।

উত্তরা ১৩৩৮

শরৎচন্দ্র

বাঙ্গালী চিরকালই তাহার সাহিত্যে সামাজিক চিত্র, ঘর-গৃহস্থালীর কথা বেশ জীবন্ত করিয়া আঁকিয়া দেখাইতে পারিয়াছে। এই বিষয়ে তাহার আছে স্বাভাবিক প্রতিভা; অন্যান্য ক্ষেত্রে কারিগরীর জন্য তাহাকে কিছু যত্ন চেষ্টা করিতে হয়। বৃহৎ জীবনের কথা, শৌর্য্য, বীর্য্য, উদাত্ত আকাঙ্ক্ষা আস্পৃহার কথা—যেখানে প্রয়োজন চেতনার বা ভাবের বিস্তার সামর্থ্য দার্ঢ্য কাঠিন্য, তাহা বাঙ্গালী শিল্পীর হাতে খুব কমই সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখনই সে তাহার গাঁয়ের, তাহার ঘরের, তাহার পারিবারিক কান্তকোমল বৃত্তির ছবি দিয়াছে, কেমন তাহা সহজ সুস্পষ্ট প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রেও এক হিসাবে অনেকখানি আমরা পাই এই সত্যটিরই সমর্থন। তিনিও বাঙ্গালীর এই চিরপরিচিত কোটের বাহিরে যাইতে চান নাই। শেষ দিক দিয়া তিনি একটু চেষ্টা করিয়াছেন বটে ফ্রেমটা কিছু বড় করিয়া ধরিতে, দৃষ্টিকে উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়া গভীরে সুদূরে তাহাকে প্রসারিত করিয়া দিতে। তবে শরৎচন্দ্রের

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, বিস্তৃতি বৈচিত্র্য অপেক্ষা একাগ্রতা তীক্ষ্ণতা বেশী। তীক্ষ্ণতারও পাই আবার মাত্রাধিক্য অর্থাৎ উগ্রতা। তাঁহার নিজের ক্ষেত্রটির মধ্যেও যে জীবন-ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নানাত্ব খুব বেশী নাই—কিন্তু সর্ব্বত্রই আছে ঝাঁঝাল সজীবতা। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর অভ্যস্ত কোটের বাহিরে যান নাই—কিন্তু সেখানে আনিয়া দিয়াছেন—গভীরতা হয়ত ততখানি নয়, কিন্তু একটা "অসীম অপরিসীম" খরতা, তীব্রতা ।

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর সমাজকে দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন ভিতর হইতে। বাহির হইতে দর্শকে যে ভাবে দেখে, সে রকমের চিত্র আগে অনেকেই দিয়াছেন—তাহাতে দর্শনের নৈপুণ্য সত্যতা, এমন কি আন্তরিকতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেন ভিতরকে উল্টাইয়া বাহিরে ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার জগতে বস্তু ঘটনা চরিত্র যাহা তাহাদের বাস্তব রূপায়নটি প্রধান কথা নয়—প্রধান কথা তাহাদের প্রাণের গতি, সেই গতির তোড়। জিনিষের একটা সম্পূর্ণ নিটোল মূর্ত্তি তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ। ঘটনার অব্যর্থ পারম্পর্য্য, ব্যক্তির অঙ্গে অঙ্গে অটুট সঙ্গতি, আবহাওয়ার একটা সহজ স্বাভাবিকতা অনেক সময়েই হয়ত পাইব না—তাঁহাতে জাগ্রত মুখরিত জিনিষের

অন্তরের প্রেরণা, আবেগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালীর সমাজের বা ব্যক্তিজীবনের যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, বাস্তবের সহিত মিলাইয়া দেখিলে হয়ত দেখিব সেখানে আছে কেমন অত্যুক্তি আতিশয্য, অতিরঞ্জন, সত্য হইলেও সত্যকে অনাবশ্যক জোরে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার প্রয়াস—ফলে একটা, অনেকে যাহার নাম দিবেন, ঠাট বা ঢঙ। কিন্তু গোটা বস্তুকে ত শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহেন নাই, তাঁহার হাতে বাজিয়াছে বস্তুর অন্তরের একটা তন্ত্রী—দেহ নয়, তাঁহার লক্ষ্য দেহগর্ভস্থ নাড়ীর ধমনীর চঞ্চল হাস্য। বাঙ্গালীর সমাজের প্রাণময় লোকে—রক্তের ধারায় কি আবেগ কি সত্য উৎকণ্ঠিত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরের দেহ-চেতনার অচলায়তনের চাপে কি কথা মুখ ফুটিয়া তাহার বলা হইতেছে না, উহাই শরৎচন্দ্রের কথা।

শরৎচন্দ্রের একটি মানুষ উত্তেজনার বশে হঠাৎ বিসদৃশ কিছু করিয়া ফেলিয়াছেন, শেষে লজ্জিত হইয়া ভাবিতেছেন "কি অভিনয় আমি এই করিলাম?" এই "অভিনয়"ই এক হিসাবে শরৎচন্দ্রের শিল্প রচনায় মূল সূত্র দিয়াছে বলা যায়। তাঁহার সৃষ্টির যে চাল যে ছন্দ, প্রাণের যে গতিভঙ্গী তাহা অনেকখানি আসিয়াছে

এই জিনিষটিকে ধরিয়া। কথায় কথায় কাঠ হইয়া নির্ব্বাক হইয়া স্তব্ধ হইয়া যাওয়া—হঠাৎ ছুটিয়া পলায়ন করা—বিস্ময়ের ব্যথার ভীতির সীমা-পরিসীমা না থাকা—গভীর অবসাদ—চিত্ত জুড়িয়া বিদ্রোহের জ্বালা—ঝর ঝর চোখের জল—অথবা প্রয়োজন মত যে ঘটনাটি যেখানে যে সময়ে ঘটিলে চমকপ্রদ হয় তাহার ব্যবস্থা—এই যত প্রকার Deus ex machina, শরৎচন্দ্রের পাতায় পাতায় তাহা ছড়াইয়া আছে।

কিন্তু রহস্যের কথা এই, এতখানি melodrama বা অতি-অভিনয়ের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি কিছু মাত্র আড়ষ্ট বা কৃত্রিম হইয়া পড়ে নাই। বরং এই সকলের কল্যাণেই তাঁহার সৃষ্টি পাইয়াছে তাহার স্বকীয় তীব্রতা, উগ্রতা। মনে হয় একটা জগৎ আছে যেখানে এই ধরণের অভিনয়ই হইল সেই জগতের সত্যের স্বাভাবিক ও জীবন্ত প্রকাশ। শরৎচন্দ্র সেই জগতের অধিবাসী আবার সেই জগতেরই স্রষ্টা।

আর একদিক দিয়া আবার কিন্তু শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি যেমন সজীব সচল, আমাদের গোচর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি পাইয়াছে বৃহত্তর একটা ছন্দেরই দোল; যেহেতু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খেলিয়াছে একটা আধুনিক

মনকে আশ্রয় করিয়া। তাঁহার বিষয়, উপকরণ ক্ষেত্র পাত্র অনেকখানি প্রাচীন পুরাতন—প্রাচীন সমাজ, পুরাতন সংস্কার, সামাজিক মানুষে মানুষে গতানুগতিক সম্বন্ধ, ব্যক্তির মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক বৃত্তি। এই সকলেরই উপর তিনি ফেলিয়াছেন আধুনিক বুদ্ধির আলোক, ইহাদিগকে দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন বর্ত্তমান যুগের জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া।

এই জিজ্ঞাসা-বৃত্তিই হইল আধুনিক মনের প্রধান লক্ষণ—জিজ্ঞাসা অর্থ জিনিষকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা, ওলট পালট করিয়া, ভিতর হইতে বাহির হইতে, সর্ব্বতোভাবে সকল দিক দিয়া; কি, কেন, কি রকম, কোথা হইতে, কোন্ দিকে? এই যাবতীয় ঔৎসুক্যই হইল জিজ্ঞাসা। অতীতের যুগে, যাহা আছে, আছে বলিয়াই তাহাকে বিনা প্রশ্নে মানিয়া লওয়া হইত—জিনিষ যেমনটি আছে তেমনটি দেখানই ছিল তখনকার শিল্পীর কার্য্য। আধুনিক মন কিন্তু যাহা আছে তাহাকে এই কুশল প্রশ্ন দিয়া পরিচয় আরম্ভ করে—"তুমি আছ? সত্য সত্যই, না ভাণ করিতেছ? সত্যই যদি আছ, তবে আছ কোন অধিকারে? তুমি না থাকিলেই বা জগতের কি আসিত যাইত?" আধুনিকের জিজ্ঞাসাবৃত্তিতে

এই রকমে মিশিয়া আছে একটা অজ্ঞেয়তা-বুদ্ধি—আসল সত্যখানা যে কি তাহা কিছুই বুঝা যায় না, এই রকম একটা সন্দিগ্ধতা।

কিন্তু ইহারই কল্যাণে আধুনিক মন পাইয়াছে একটা পরম ঔদার্য্য। সকল জিনিষকেই সে দিতেছে সমান মর্য্যাদা। এককালে যাহা ছিল মন্দ বা পাপ, ব্যক্তিগত নীতি হিসাবে হো'ক আর সামাজিক রীতি হিসাবেই হো'ক—এখন তাহাকে আর তত মন্দ তত পাপ বলিয়া মনে হয় না। আর যাহা ছিল ভাল পুণ্য, তাহাকেও তত উঁচুতে রাখিতেছি না। জগতে যে একটিমাত্র সত্য বা সুন্দর বা মঙ্গল আছে তাহা নয়; একটি বিশেষ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল যে আর সকলের উপরে, তাহাও নয়। আছে অনেক সত্য সুন্দর মঙ্গল—প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম্মে মহান্‌। জগতে সব জিনিষই আপেক্ষিক কিন্তু আপেক্ষিক বলিয়া যে আবার তুচ্ছ বা মিথ্যা তাহাও না হইতে পারে।

দাম্পত্য ও একান্নবর্ত্তিতা—আমাদের সমাজ-বন্ধনের এই দুটি মুল সূত্র শরৎচন্দ্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। একান্নবর্ত্তিতার যে কি দোষ কি ত্রুটি, ব্যক্তি-জীবন এবং সামাজিক জীবনে যে কি বিষ

তাহা আনিয়া দিতেছে, তাহার চিত্র যত স্পষ্ট হইতে পারে, তাহা তিনি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা অবশ্য আধুনিক সকল বিদ্রোহ বা iconoclasm এর কাজ। বিদ্রোহী হিসাবে শরৎচন্দ্র কাহারও পিছনে নহেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার তেমনি দরদ দিয়া নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন এই সুপ্রাচীন ব্যবস্থাটির সত্য কোথায়, সৌন্দর্য্য কোথায়—ইহাতেও ফুটিয়া উঠিতে পারে কি মহত্ত্ব। বিবাহের সংস্কার বা দাম্পত্য সম্বন্ধ একদিক দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন কেমন প্রাণহীন প্রথা, গোষ্ঠীজীবনের কাছে ব্যক্তির আত্মবলি; কিন্তু এই অনুষ্ঠানেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, ইহাকেও গভীর সত্যে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তোলা যায়, উন্নীত করা যায় একটা জীবন্ত উদাত্ত চেতনার স্তরে—প্রাচীন হিসাবে নয়, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ প্রভৃতি কোন মানসিক আদর্শের আজ্ঞায় নয় কিন্তু (কিম্বা হয়ত ইহারও পশ্চাতে ছিল একটা) অধুনা-সম্মত প্রাণের সত্যকার যে দাবি তাহার কল্যাণে। একই বস্তুর মধ্যে এই যে দ্বিধা প্রকৃতি, ইহাই অনেক সময়ে শরৎচন্দ্রের রচনায় দিয়াছে তাহার dramatic interest, ঘটনায় ঘটনায় চরিত্রে চরিত্রে একটা তীব্র সঙ্ঘাত।

আধুনিকের সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী চেতনার আলোকে প্রাচীনের সমাজ সংস্কার রীতি নীতি ভাঙ্গিয়া গলিয়া যাইতেছে, আর ভাঙ্গিয়া গলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহারা যেন শেষ একবার তাহাদের স্বকীয় একটা সত্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া আসিয়া দেখা দিতেছে। শরৎচন্দ্র এই সন্ধি-জগতের, এই সন্ধিযুগের দ্রষ্টা ও শিল্পী। তাঁহাতে দেখিতে পাই পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থার ও মানুষের ছিল কোথায় জীবন, কোথায় প্রাণ, কোথায় আকর্ষণী শক্তি—সেই সঙ্গেই আবার পাই কি ত্রুটি. কি অসম্পূর্ণতা কি অনুপযোগিতা, কি অমানবিকতা তাহাদিগকে কেবল অতীতেরই বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অনেক মানুষের মধ্যে আবার পুরাতনের ও নূতনের যুগপৎ সমাবেশও পাই। কাঠামোটা পুরাতন কিন্তু তাহাতে তিনি ভরিয়া দিয়াছেন নূতন জীবনের উগ্র সুরা। তাঁহার অনেক নারী আধুনিক স্বাধীনার মতি গতি পাইয়াছে, যদিও সে মতি গতি খেলিয়াছে পুরাতন আবেষ্টনে, গতানুগতিক ব্যবস্থায়। পরে ("পথের দাবী"তে ও "শেষ প্রশ্নে") এই আবেষ্টনও তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন—তবে নূতন আধার তিনি দেন নাই, কেমন বোধ হয় সেখানে মুক্ত প্রাণটি অশরীরী হইয়া ত্রিশঙ্কুর

মত হাওয়ায় ঘুরিতেছে—জীবন্ত দেহ, বাস্তব আয়তন তাহা পায় নাই, কেবল মস্তিষ্কের চিন্তাকে জল্পনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

আধুনিক জগতে জীবনে যে বিপুল ভাঙ্গা-গড়া চলিয়াছে—তাহার একটা ধাক্কা আমাদের পারিবারিক কোণে, আমাদের ঘরমুখী প্রাণের উপরে পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে—সেখানেও তুলিয়া দিয়াছে সমস্যা সব। সমস্যার পূরণ করিবেন, যাঁহারা পারিবেন। শরৎচন্দ্র শিল্পী, সমস্যাসঙ্কুল জীবনের একটা জীবন্ত আলেখ্য যদি তিনি সম্যক্ দিয়া থাকেন তাহাতেই তাঁহার শিল্পীর কাজ শেষ হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

শ্যামাকান্ত

বাঙ্গালীর প্রতিনিধি হিসাবে আর একজন মহাপুরুষের কথা বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল * * সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ক্ষেত্রে তিনি দেখাইয়াছেন বাঙ্গালীর কৃতিত্ব। তাঁহার নাম শ্যামাকান্ত—পরে যিনি হইয়াছিলেন সোঽহং স্বামী। সোঽহং স্বামী নয়, আমি শ্যামাকান্তেরই প্রতিভার কথা উল্লেখ করিতেছি। বাস্তবিক, শারীরিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার যে সিদ্ধি ছিল তাহাকে প্রতিভা ছাড়া আর কিছু নাম দেওয়া যায় না। এখানেও বাঙ্গালী দেখাইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য, তাহার স্বকীয়তা। শ্যামাকান্তের শরীরের বল শুধু শারীরিক বল ছিল না—তাহা ব্যায়ামের কসরতের অভ্যাসের চর্চ্চার ফল মাত্র ছিল না। সেই শারীরিক বলে বা সামর্থ্যে ছিল কেমন একটা magic—যাদু, মন্ত্রশক্তি। শ্যামাকান্ত জঙ্গলী সিংহকে

ব্যাঘ্রকে নিমেষের মধ্যে বশীভূত করিয়া ফেলিতেন, কেবল গায়ের জোরে নয়। মনের জোর বা moral forceএর কথা আমি এখানে বলিতেছি না—যদিও সাহস স্থৈর্য্য আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণ শ্যামাকান্তে অপরিমিত পরিমাণেই ছিল এবং তাঁহার শারীরিক বলকে আরও বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছিল। আমি বলিতেছি শারীরিক বলেরই একটা বিশেষত্বের কথা—তাহা এই, শ্যামাকান্তের শারীরিক বল যেন অস্থির মধ্যে ততখানি ছিল না যতখানি ছিল তাহা মজ্জার মধ্যে, পেশীর মধ্যে ততখানি ছিল না যতখানি ছিল যেন রক্তের মধ্যে, স্নায়ুর (tendon) মধ্যে ততখানি নয়, যতখানি শিরার (nerve) মধ্যে। মজ্জার সরসতা, রক্তের তেজ, শিরার দৃঢ়তা—তাঁহার শরীরের মধ্যে প্রবাহিত রাখিয়াছিল একটা সুস্থ সুসঙ্গত সমর্থ অক্ষত প্রাণশক্তির স্রোত; এবং ইহাই ছিল তাঁহার শারীরিক সামর্থ্যের উৎস। তাই তাঁহার শরীরের জোর কলের জোরের মত কিছু ছিল না—তাহাতে ছিল একটা সহজ সজীবতা, ছিল যেন প্রকৃতিরই নিজস্ব একটা অমোঘ গতি। বন্য হিংস্র জন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদানত হইত, অনুভব করিত তিনি তাহাদের প্রভু, রাজা।

শ্যামাকান্ত দেহের মধ্যে দৈহিক শক্তিকে ধরিয়া পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির শারীরিক শক্তির সহিত ঐক্য একাত্মতা। এই দেহগত সোঽহং উপলব্ধিই বোধ হয় শেষে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল দেহাতিরিক্ত সোঽহং উপলব্ধির মধ্যে।